অঞ্জন দত্ত

ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি

গোয়েন্দা সুব্রত শর্মার তিনটি রহস্য কাহিনি



এই ভাঙাচোরা আধুনিক নাগরিক মানুষটি লেখাপড়া জানে, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই সফল হতে পারছে না, সে একটা জিনিসই পারে তা হল 'সত্য'টা খুঁজতে। তার গায়ে খুব বেশি একটা জোর নেই, কারণ গায়ের জোর থাকার বিষয়টা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে। ভালো গোয়েন্দাদের গায়ের জোর থাকে না, বুদ্ধি থাকে, সঙ্গে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিও। বুদ্ধি তো অনেক কাজেই লাগে। ডাক্তারকেও বুদ্ধিমান হতে হয়, লেখককেও বুদ্ধিমান হতে হয়, একজন অভিনেতাকেও বুদ্ধিমান হতে হয়, যে কোনো কাজ করতে গেলেই বুদ্ধিমান হতে হয়। তবে গোয়েন্দারা বেশি বুদ্ধিমান কেন? কারণ সে খুঁজছে, তার তাৎক্ষণিক মন তাকে খোঁজাচ্ছে, তার জিজ্ঞাসু মন তাকে খোঁজাচ্ছে। ভগবান জানে সে কী খুঁজছে, কিন্তু সে অন্য লোকের নোংরা খুঁজে চলেছে। সেই মানুষটাকে ধরতে পারলে সেই সময়টাকেও ধরতে পারব। এমন কিছু মানুষকে সমাজ-দূরবর্তী নিরপেক্ষ মন নিয়ে থাকতে হয়, দূর থেকে সমাজকে দেখবার জন্য। গোয়েন্দা দূর থেকে দেখে। সে সংসারে কিছু দিতে পারে না, বিয়ে করেছে অথচ কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না, সন্তানের দায়িত্ব নিচ্ছে না। অন্য লোকের বাড়ির দায়িত্ব নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাউন্ডুলে টাইপ একটা। এরকম বাউন্ডুলে মেজাজ না হলে সে সমাজকে দূর থেকে দেখতে পারবে না।

ISBN : 978-93-94079-91-5

DANNY DETECTIVE INC
Three Mystery Stories in Bengali
by Anjan Dutta
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : (033) 2241 2330/2219 7920/2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 250.00

ISBN : 978-93-94079-91-5

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২২, ফাল্গুন ১৪২৮

প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী

২৫০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে। বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ছন্দা, গোডো
এবং
সুপ্রভাত,
আমার সুব্রত শর্মাকে

অঞ্জন দত্তের গোয়েন্দা
ভুলে-ভরা বাউন্ডুলে বেপরোয়া

শিলাদিত্য সেন : আপনি হঠাৎ গোয়েন্দা গল্প লিখতে গেলেন কেন?

অঞ্জন দত্ত : গোয়েন্দা গল্প ছোটবেলা থেকেই আমার খুব প্রিয় সাহিত্য। আমি গোয়েন্দা গল্প নিয়ে বেশ অনেক ক'টাই সিনেমা করেছি। প্রথমে আমি নিজেই নিজের একটা গোয়েন্দা চরিত্র তৈরি করে সেটা 'রুদ্র সেনের ডায়েরি' বলে দূরদর্শনে একটা সিরিজ করেছিলাম যেটা বেশ পপুলার হয়েছিল।

তারপরে আবার ফিরে গিয়ে শরদিন্দুবাবুর ব্যোমকেশকে নিয়ে ছ'টা সিনেমা করেছি। এইবার আবার একটা গোয়েন্দা ফ্রাঞ্চাইজি করলাম 'ক্লিক ওটিটি'-র জন্য, 'ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি'। একটা গোয়েন্দা গল্প ডিটেকটিভ এজেন্সি নিয়ে। এই এতগুলো কাজ করতে করতে আমার মনে হল আমি যে গোয়েন্দা গল্পগুলো করছি বা গোয়েন্দা সাহিত্য থেকে সিনেমা করছি, আমার নিজের একটা কালমিনেশন দরকার। মানে গোয়েন্দা গল্প দেখি বলে বা গোয়েন্দা গল্প ভালো লাগে বলে নয়, নিজের জন্য নিজেকে একটা কিছু লিখতে হবে। আমাকে দু'একজন প্রকাশক বন্ধু আগে বলেছিলেন 'রুদ্র সেনের ডায়েরি'টাকে গল্পাকারে প্রকাশ করতে, মানে স্ক্রিপ্টগুলো প্রিন্ট করে বের করতে।

শি : করলেন না কেন?

অ : এর আগে অনেক প্রকাশক এসেছিলেন স্ক্রিপ্টগুলো

ছাপার ব্যাপারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি একটা স্ক্রিপ্টকে সাহিত্য হিসাবে ধরি না। একটা স্ক্রিপ্ট কীভাবে সাহিত্য হতে পারে? তার মানে কি আমি স্ক্রিপ্ট পড়িনি? আগে অনেকের স্ক্রিপ্ট ছাপা হয়েছে। আন্তনিওনির, সত্যজিৎ রায়ের, উডি অ্যালেনের, অনেকেরই। সেইগুলো সিনেমা রিসার্চের জন্য ঠিক আছে। কিন্তু সাধারণভাবে, সাধারণ মানুষ পড়েন না। পড়েন, অবশ্যই পড়েন, যাঁরা রিসার্চ করছেন তাঁরা পড়েন।

শি : হ্যাঁ। ফিল্ম নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা করেন, স্কলার, ক্রিটিক, তাঁদের জন্য ঠিক আছে।

অ : সাধারণ পাঠকের জন্য নয়।

শি : হতে পারে। প্রকাশকেরাই ভালো বলতে পারবেন।

অ : এবার এই সিরিজটা যখন তৈরি হচ্ছে, আমি লিখছি, আরেকটা লিখব। গল্পগুলো তৈরি করতে হবে। একটা গোয়েন্দা হয়ে ওঠার গল্প তৈরি করছি। আমার গল্পের যে মূল নায়ক সুব্রত শর্মা, এজেন্সিতে চাকরি করতে এসে আস্তে আস্তে গোয়েন্দা হয়ে উঠছে, তার ভূমিকায় যে অভিনয় করছে সুপ্রভাত, সে একদিন বলল, 'আপনি রুদ্র সেনগুলো লিখে ফেলুন।' এরকম হতে হতে আমার মনে হল যে আমি তাহলে চেষ্টা করে দেখি, লিখি। কারণ সত্যি তো আমাকে গল্প আকারে লিখতে হবে। এরপর এর থেকে সিরিজ করব, না সিনেমা করব, সেটা না ভেবে গল্প হিসেবেই চেষ্টা করি লিখতে। এর আগেও আমার কাছে প্রকাশক এসেছিলেন ইংরেজিতে লেখার জন্য, মানে ইংরেজিতে বই লেখার জন্য। তখন আমার মনে হয়েছিল যে, না, আমি তো বাংলায় কাজ করছি। আমি গান যদি বাংলায় লিখি, ছবি যদি বাংলায় করি, তাহলে গল্প আমি ইংরেজিতে কেন লিখব? ইন্দো-ইংলিশ সাহিত্য যে সব আছে তা আমি প্রচুর পড়েছি এবং ভালোও লাগে পড়তে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি তা কেন করব? বাঙালি পাঠকদের জন্যই তো লিখব।

আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে, আমার লিখতে আসা। এমনি আমি খবরের কাগজের জন্য এখানে ওখানে

লিখেছি। কিন্তু এই লিখতে আসার ব্যাপারটা যে কারণে আমাকে আরও উদ্বুদ্ধ করে, সেটা হল সাহিত্যভাবনা। সাহিত্য আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আর্ট ফর্ম। কেউ কেউ বলবেন সংগীত হল চূড়ান্ত শিল্পকলা, যা অধরা। কিন্তু আমার মনে হয় সাহিত্য হল এমন একটা শিল্প যা অনেক অনেক বেশি বিমূর্ত। কারণ এর অক্ষর এবং শব্দ। এখানে শব্দের ভিত্তিতে মানুষ কল্পনা করে। এটা আরও বেশি জটিল।

শি : বাহ্! সুন্দর বললেন তো, তর্ক থাকলেও ভাবানোর মতো কথা...

অ : এইভাবে লিখতে পারাটা খুব দরকার। আমি সাংবাদিকতা করেছি, আমি থিয়েটার করেছি, থিয়েটারে ডিরেকশন দিয়েছি, আমি সিনেমায় অভিনয় করেছি, সিনেমা ডিরেক্ট করেছি, গান লিখেছি। এই এতগুলো জিনিসের পর আমার মনে হল যে এই একটা জিনিস আমি পারব করতে। মনে হয় পারব। এটা এখন যদি না করি তাহলে বোধহয় আর হবে না। দেরি হয়ে যাবে। তাই লেখার চেষ্টা করি।

লেখা শুরু করতে গিয়ে দেখলাম গোয়েন্দা নিয়ে লেখাই সবচেয়ে ভালো। এক তো গোয়েন্দা নিয়ে আমায় ভাবতে হচ্ছে, দুটো-তিনটে কেস আমাকে লিখতে হবে, তাহলে স্ক্রিপ্ট না লিখে গল্প হিসাবে লিখি। সাহিত্যতে আসার চেষ্টা মানে গল্প লেখা। সেটা ভূতের গল্প হতে পারত, ছোটগল্প হতে পারত, অন্যকিছুও হতে পারত। কিন্তু আমার কাছে যেহেতু গোয়েন্দা গল্প খুব প্রিয়, আমি গোয়েন্দা গল্প পড়েছি, এখনও পড়ি, ছোটবেলা থেকেই পড়ছি, তাই ঠিক করলাম যে এটাই লিখব। এই সিরিজটাই লিখব।

শি : এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে। দেখুন, আপনাকে আমরা যেভাবে চিনি শিল্পের জায়গা থেকে, এই ধরুন অভিনয়। অভিনয়ে আপনার একটা পারদর্শিতা আছে, অভিনয়শিল্পী আপনি, আপনি সংগীতশিল্পী, আপনি থিয়েটার নির্দেশক শুধু নন, আপনি থিয়েটারে অনুবাদ বা রূপান্তরও করেছেন। আপনি একজন

চলচ্চিত্রনির্মাতাও। এই সিনেমা, থিয়েটার, গান সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়ে আপনি গিয়েছেন। কিন্তু আপনি এখন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন যে, আপনি সাহিত্যে আসতে চেয়েছেন কারণ এখানে শব্দ নিয়ে বিমূর্তের খেলাটা আরও বেশি খেলা যায়।

অ : আমি মনে করি, সাহিত্য উঁচু ধরনের শিল্পকলা।

শি : আপনি তাহলে মনোনিবেশ করছেন সাহিত্য লেখায়। এখানে আমার একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন আছে। আপনি চিত্রনাট্য করেছেন, 'ব্যোমকেশ' ছবি করার সময়, 'ক্লিক ওটিটি' প্ল্যাটফর্ম-এর আগে থেকে 'ব্যোমকেশ' করছেন, আমরা 'রুদ্র সেনের ডায়েরি' দেখেছি। আমরা জানি এ ছাড়াও আপনি অন্য ধরনের মানবিক জীবনের ছবিও করেছেন। যেমন ধরুন 'দত্ত ভার্সেস দত্ত', নাম উল্লেখ করেই বলছি, এই যে ছেলেটার বড় হওয়া এটা অনেকটাই তো আপনার আত্মজীবনকেন্দ্রিক। সেখানে আপনার জীবনে কতখানি জুড়ে ছিল এই ডিটেকটিভ থ্রিলার? খুব জানতে ইচ্ছে করছে এর পিছনে আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতাটা কী? আপনার পড়ার অভিজ্ঞতাটা কী? যদি একটু বলেন।

অ : এ পর্যন্ত যা যা আমি করেছি, সাংবাদিকতা, নাটক অনুবাদ করা, চিত্রনাট্য লেখা, গান লেখা, এই সবই কিন্তু লেখা।

শি : তা তো বটেই।

অ : লেখা। আঁকা নয়, ফোটোগ্রাফি নয়।

শি : না, না। লেখা, শব্দ শব্দ।

অ : আমি মনে করি একটা সিনেমার যদি চিত্রনাট্য ভালো না হয় তাহলে কোনোদিনই একটা ভালো সিনেমা তৈরি হবে না।

কিছুতেই হবে না। আমি মনে করি একটা গানের কথা যদি ভালো না হয় সেটা কোনোদিনই একটা ভালো গান হতে পারে না। শুধু সুর দিয়ে একটা ভালো গান হয় না। একটা থিয়েটারের বিষয় যদি ভালো না হয় শুধু আঙ্গিক দিয়ে সেটা ভালো করতে পারা যায় না। এই লেখাও সেই চূড়ান্ত শিল্পকলারই অংশ।

শি : অবশ্যই।

অ : ছোট থেকে আমি সাহিত্য পড়া শুরু করেছি গোয়েন্দা গল্প দিয়ে। সাহিত্যে আমার প্রবেশমাধ্যমই হল গোয়েন্দা গল্প। প্রাথমিকভাবে আমি বই পড়া শুরু করেছিলাম আমেরিকান গোয়েন্দা, মার্কিন গোয়েন্দাদের দিয়ে। ড্যাশিল হ্যামেট, রেমন্ড স্যান্ডলার, জেমস হ্যাডলি চেজ, চটি বই বা পাল্প যাকে বলা হয় আর কি। এদের দিয়েই আমার বই পড়া শুরু হয়। তারপরে ব্রিটিশ সাহিত্যে পড়তে পড়তে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের পড়েছি। ধরুন আগাথা ক্রিস্টি, আর্থার কোনাল ডয়েল, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর বাংলা বই পড়া শুরু হয় এখানে এসে। বাংলায় যখন আমায় অভিনয় করতে হবে, বাংলায় যখন আমায় থাকতে হবে, কাজ করতে হবে, বাংলা জানতে হবে ভালো করে, তখন অনেকেই, তাঁরা থিয়েটারের মানুষ, যেমন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, এঁরা বলেন আমাকে—ভাই তুমি বাংলাটা ভালো করে শেখো। বাংলা বই পড়ো।

আমার কিন্তু বাংলা বই পড়ার প্রতি আকর্ষণ এসেছে রবীন্দ্রনাথ পড়ে বা অন্য কিছু পড়ে নয়, বাংলা গোয়েন্দা গল্প পড়ে। একদিন আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার কী ধরনের বই পড়তে ভালো লাগে? আমি বলেছিলাম গোয়েন্দা গল্প। তখন উনি বলেন, বাংলা সাহিত্যে এত গোয়েন্দা আছে সেগুলো পড়ো। আমার প্রেমেন মিত্তিরের সঙ্গে পরিচয় পরাশর বর্মার মারফত। আমার পরিচয় সুনীল গাঙ্গুলির সঙ্গে কাকাবাবুর মারফত। আমার পরিচয় শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে কিন্তু 'ঝিন্দের বন্দি' পড়ে নয়, ব্যোমকেশের মাধ্যমে। আমার সকল সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁদের গোয়েন্দাদের মাধ্যমে। আমি 'প্রথম আলো' পড়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে চিনিনি। আমার কাছে যেটা সহজ মনে হয়েছে আমি সেটা পড়ে বাংলা বই পড়তে শিখেছি। আমার রহস্য রোমাঞ্চ খুব ভালো লাগত। খুব জানতে ইচ্ছে করত কে খুনি, এটা কে করেছে? ওটা কে করেছে? এই করতে করতে বাংলা পড়ার অভ্যাসটা আমি তৈরি করেছি। আমার বই পড়ার অভ্যাসটা

শুরু হয়েছে মার্কিন গোয়েন্দাদের দিয়ে, আর বাংলা বই পড়ার অভ্যাসটা শুরু হয়েছে বাংলা গোয়েন্দা গল্প পড়ে। আমি প্রায় বাংলার সমস্ত গোয়েন্দা গল্পই পড়েছি। এটাই আমার বাংলা শেখার ইতিবৃত্ত।

ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা আক্ষেপ আছে। অনেকে মনে করেন গোয়েন্দা গল্প হয়তো ঠিক উঁচু মাপের সাহিত্য নয়, কিন্তু আমার মনে হয় ভালো গোয়েন্দা গল্প অবশ্যই উঁচু মাপের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

শি : এই যে আপনি বললেন, উঁচু মাপের সাহিত্য, আপনার পড়ার যে অভিজ্ঞতা, সেখানে আপনি কি উঁচুদরের সাহিত্য বলতে কোনো বিভাজন করছেন? আমি খারাপ ভালোর কথা বলছি না। দু'জন রহস্য গল্পলেখকের লেখার ধরন আলাদা। এর মধ্যে কোনো এক ধরনের গোয়েন্দা সাহিত্য হয়তো আপনার কাছে বিশেষভাবে প্রিয়। সেটা যদি আমাদের বলেন।

অ : আমার মনে হয় গোয়েন্দা গল্প প্রথমত খুবই প্রাপ্তবয়স্কদের গল্প।

শি : এটা আপনি মানেন? বিশ্বাস করেন?

অ : হ্যাঁ। কারণ গোয়েন্দা গল্প পুরোটাই অপরাধ জগৎকেন্দ্রিক। সমাজের নোংরা দিকটা দেখায়, সমাজের অন্ধকার দিকটা দেখায়। এই জন্য ভালো গোয়েন্দা গল্পে অনেক বেশি সমাজকে চেনা যায়। সেই সময়কার সমাজটাকে ধরা যায়। ভালো গোয়েন্দা গল্প সময়ের মানসিকতাকে ধরিয়ে দিতে পারে। কী চলছে চারপাশে, মানুষের ভিতরের অন্ধকার দিক, মানসিক অবক্ষয়, সামাজিক অবক্ষয়, ক্ষমতা, ক্ষমতার লোভ—সমস্ত কিছু খুব প্রচ্ছন্নভাবে বেরিয়ে আসে। সেই কারণে আমি এটাকে বলছি বড় মাপের। এবং বিভাজন তো অবশ্যই আছে। যাবতীয় গোয়েন্দা গল্পগুলোর মধ্যে আমার কাছে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে শরদিন্দুবাবুর লেখা। শরদিন্দুবাবুর লেখার মধ্যে কিন্তু আমি যেগুলো বললাম, সমাজ, রাজনীতি, সময় সব খুব ভালোভাবে বেরিয়ে আসে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের সেই চেহারাটা দেখা যায় যেখানে নতুন ধরনের অর্থনীতি আসছে, মানুষের হাতে টাকা আসছে, সে টাকা পেয়ে চেনা মানুষ কেমন বদলাচ্ছে, এই টাকা, ক্ষমতা, অবক্ষয়, ক্ষমতার পিছনে ভয়ংকর নোংরামি—সবকিছুকে নিয়ে উনি এমনভাবে গল্পে লিখেছেন যে, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়টাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। প্রথম দু-তিনটি গল্পে রয়েছে ব্রিটিশ সময়কার যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপট। তারপর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সামাজিক অবক্ষয়। 'বেণীসংহার'-এ যে ছেলেটা রাজনীতি করে তাকে পরিবারের কেউ পছন্দ করে না। 'কহেন কবি কালিদাস'-এ অনেগুলো প্রশ্ন উঠে আসছে, 'রক্তের দাগ' ও 'আদিম রিপু'তেও অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে আসছে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে। যে মানুষটা ভীষণ খারাপ, সে খারাপটা হলো কী করে? তার উৎসটাও কি ভালো ছিল? এইসব জিনিসগুলো আমার কাছে খুব প্রাপ্তবয়স্ক বিষয় মনে হয়েছে এবং সামাজিকভাবে জরুরি বিবৃতি মনে হয়েছে। সেইজন্য আমি অবশ্যই এখানে একটা বিভাজন করি।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অবশ্য বাংলা অথবা ব্রিটিশ গোয়েন্দা গল্পগুলো থেকে আমেরিকান গোয়েন্দা গল্পগুলো অনেক বেশি বাস্তবধর্মী ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ সেখানে আমেরিকার যুদ্ধপরবর্তী দুর্নীতিগ্রস্ত অবসাদময় জীবনটা উঠে এসেছে। যেখানে এক শ্রেণি প্রচণ্ড বড়লোক, আরেক শ্রেণি অত্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত। সমাজে চাকরি নেই। সম্পূর্ণ দেশজুড়ে একটা হাহাকার, তার মধ্যে থেকে একটা মানুষ—যে 'সত্য' খুঁজে চলেছে, সে কখনওই একজন আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সে সত্য খুঁজছে, সে মার খাচ্ছে, কোনোমতে তার একটা এজেন্সি টিকে আছে, সে একটা বহিরাগত, সে সত্যটা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কোনোমতে ন্যায়বিচার আনতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত সে জিতে যাচ্ছে কারণ সে দেখতে পাচ্ছে কতদূর গেল নোংরামিটা। সমাজের এই ভাঙাচোরা দিকটা সব থেকে বেশি পাই আমেরিকান গল্পে। বাংলায় যেটা আমি খুব কম পাই।

শি : এই যে আপনার গোয়েন্দা নির্মাণ, গল্পে লিখেছেন, তাতে যে গোয়েন্দা থাকবে, বা আপনার তৈরি ব্যোমকেশ যখন দেখছি, তখন ব্যোমকেশের বয়ানে আপনি বলছেন যে, সত্যের অন্বেষণই করে চলে ব্যোমকেশ। সমাজ হয়তো পাল্টায় না কিন্তু সত্যটাকে খোঁজাই তার কাজ।

অ : এটা আমার খুব বিস্ময়কর লাগে যে একটা লোক গোয়েন্দা হবে কেন? এত চাকরিবাকরি ছেড়ে সে কেন সত্য অন্বেষণে নিষ্ঠাবান হবে? কারণ তার মধ্যে অন্য কোনো স্থিরতা নেই। সে সমাজের তথাকথিত কাজকর্ম বা নিয়মের বাইরের একজন মানুষ। সে হয়তো ভালো চাকরি করতে পারত কিন্তু ইচ্ছে নেই। সে ভালো সাংবাদিক হতে পারত কিন্তু অফিস যাবে না। অর্থাৎ সে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে। এই অ্যাডভেঞ্চারটা তাকে সমাজের নোংরার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সে সমাজের নোংরা ঘেঁটে টাকা রোজগার করছে। সে তো আর পাঁচটা বিয়ে-করা বাঙালির মতো হতে পারবে না। সে খুব সাধারণ মানুষই হবে। কিন্তু তার মধ্যে একটা একা সমাজ-দূরবর্তী নিরপেক্ষ মন থাকবে। সে খুব বড় একটা দুর্নীতি খোলসা করতে সক্ষম হবে কিন্তু ন্যায়বিচার আনতে পারবে কি না জানে না। সে পৃথিবী বদলাতে পারবে না। সে এটা করে যাবে অনেকটা জাপানি সামুরাইয়ের মতো, কিংবা ব্রিটিশ নাইটদের মতো। সে খুব একটা মাইনে পাবে না, টাকার জন্য যে সে এটা করছে তা নয়, করছে সত্যি খোঁজার নেশার জন্য। তার জীবনে প্রেম আসবে কিন্তু সে প্রেম থাকবে না, সে বিয়ে করতে পারবে না, সংসার করতে পারবে না। কারণ সে অন্য মানসিকতার মানুষ। তা না হলে সে এই কাজ করবে কেন? অন্য লোকের নোংরা ঘাটবে কেন? এমন কিছু টাকা তো সে পাচ্ছে না। সে একটু অন্যরকম। এরকম বাঙালির মধ্যে থাকতে পারে, জাপানির মধ্যে থাকতে পারে, আমেরিকানের মধ্যে থাকতে পারে, ব্রিটিশদের মধ্যেও থাকতে পারে, যে কারওর মধ্যেই থাকতে পারে, কিন্তু সে পরিপাটি মানুষ হবে না।

এই ভাঙাচোরা আধুনিক নাগরিক মানুষটি লেখাপড়া জানে, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই সফল হতে পারছে না, সে একটা জিনিসই পারে তা হল 'সত্য'টা খুঁজতে। তার গায়ে খুব বেশি একটা জোর নেই, কারণ গায়ের জোর থাকার বিষয়টা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে। ভালো গোয়েন্দাদের গায়ের জোর থাকে না, বুদ্ধি থাকে, সঙ্গে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিও। বুদ্ধি তো অনেক কাজেই লাগে। ডাক্তারকেও বুদ্ধিমান হতে হয়, লেখককেও বুদ্ধিমান হতে হয়, একজন অভিনেতাকেও বুদ্ধিমান হতে হয়, যে কোনো কাজ করতে গেলেই বুদ্ধিমান হতে হয়। তবে গোয়েন্দারা বেশি বুদ্ধিমান কেন? কারণ সে খুঁজছে, তার তাৎক্ষণিক মন তাকে খোঁজাচ্ছে, তার জিজ্ঞাসু মন তাকে খোঁজাচ্ছে। ভগবান জানে সে কী খুঁজছে, কিন্তু সে অন্য লোকের নোংরা খুঁজে চলেছে। সেই মানুষটাকে ধরতে পারলে সেই সময়টাকেও ধরতে পারব। এমন কিছু মানুষকে সমাজ-দূরবর্তী নিরপেক্ষ মন নিয়ে থাকতে হয়, দূর থেকে সমাজকে দেখবার জন্য। গোয়েন্দা দূর থেকে দেখে। সে সংসারে কিছু দিতে পারে না, বিয়ে করেছে অথচ কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না, সন্তানের দায়িত্ব নিচ্ছে না। অন্য লোকের বাড়ির দায়িত্ব নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাউন্ডুলে টাইপ একটা। এরকম বাউন্ডুলে মেজাজ না হলে সে সমাজকে দূর থেকে দেখতে পারবে না।

শি : তাহলে বৈশিষ্ট্যর জায়গা থেকে এই যে বহিরাগত শব্দটা বললেন, সে তো ব্যোমকেশও দূর থেকে দেখে, ফেলুদাও দূর থেকে দেখে, আমি তা বলছি না। আমি বলছি, আপনি আপনার গোয়েন্দার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন, একটা অসফল মানুষ, এবং ভালোমন্দ মেশানো, তাকে নানারকম সাংসারিক সামাজিক জটিলতার ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে, সাধারণত গোয়েন্দারা যেরকম হয়, আপনার গোয়েন্দা কিন্তু তা নয়।

অ : না, না।

শি : আমি এটা একটু বিশদে জানতে চাই।

অ : আমার গোয়েন্দারা খুব গোছালো নয়। তারা কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারে না। তাদের চুরি করতে হয়, মিথ্যে বলতে হয়, তাদের পিস্তল থাকে না, অন্যের পিস্তল চুরি করতে হয়। এই যে একটা অগোছালো বাউন্ডুলে টাইপ, এটা দরকার। ফেলুদার একটা বিষয় আমাকে খুব টানে সেটা সব গোয়েন্দাদেরই থাকা উচিত, সেটা হল ভ্রমণপিপাসা, বেরিয়ে পড়া, পিছুটান না থাকা। এই বেরিয়ে পড়া ব্যাপারটা কাকাবাবুতেও আছে। এই যে বেরিয়ে পড়ছে, যেকোনো জায়গায় চলে যাচ্ছে। বাউন্ডুলেরাই তো বেরিয়ে পড়ে। ঘর ছেড়ে দেখে, এদিকে কী হচ্ছে, ওদিকে কী হচ্ছে, অন্য লোকের ঘরে কী হচ্ছে। সব সময় কেস সলভ করতে তা নয়, কিছু জানতে বেরিয়ে পড়ে। এই বেরিয়ে পড়াটা আমার ভালো লাগে।

কিন্তু আমার গোয়েন্দারা হেরে যাবে, ফেল করবে, তারপর চেষ্টা করতে করতে সত্যিটা জানতে পারবে। তারা সব থেকে বুদ্ধিমান হতে পারে না। আমার কাছে এটাই মানতে অসুবিধা হয় যে অ্যাডভেঞ্চারের গোয়েন্দারা সব দিক থেকে ঠিক, প্রায় দেবতার মতো। সে সব দিক থেকে ঠিক, এমনটা তো হয় না।

পুলিশকে তারা বোকা ভাবে। মানে সে এমন কিছু কাজ করেছে যেটা পুলিশের কাজ। পুলিশ সেটা মেনে নেবে কেন? সেই অসুবিধার তাকে সম্মুখীন হতে হবে। কিছু বেআইনি কাজও করে ফেলবে সে। কাজে সফলতা পেতে হলে তাকেই সব করতে হবে, অন্যের বাড়িতে ঢুকে পড়তে হবে, মিথ্যে কথা বলতে হবে এবং সবশেষে বিশ্বাসযোগ্য কিছু একটা করতে হবে। সত্যি যদি এমন লোক হয়, তার কথার ভিত্তিতে দুর্নীতি বন্ধ হবে না, কিন্তু সেটা সে খুলে দেখিয়ে দেবে সকলের সামনে। আর এখানেই তার জিত। নৈতিক জয়। আইনত হয়তো সে জিততে পারবে না, কিন্তু নীতিনৈতিকতায় সে জিতে যাবে।

শি : আচ্ছা এই একটু আগে আপনি বললেন না যে, আপনি গোয়েন্দা সাহিত্যকে খুব উঁচুদরের সাহিত্য মনে করেন। এই ব্যাপারে যদি একটু বলেন। আপনি কি মনে করেন গোয়েন্দা সাহিত্যের মধ্যেও দু'রকমের ভাগ আছে, কোনোটা উঁচুদরের

সাহিত্য কোনোটা নিচুদরের? আরেকটি প্রশ্ন, আপনি গোয়েন্দা সাহিত্যকে বলেছেন উঁচুদরের সাহিত্য, সেটা পণ্ডিতেরা নিচু চোখে দেখেন বলে সেই মানসিকতাটাকে ভাঙার জন্য বলেছেন?

অ : খুব স্থূল গোয়েন্দা গল্প আছে। যেখানে খুব তাড়াতাড়ি একটা বদমাইশ লোক ধরা পড়ে গেল, খুব সহজেই সব কিছুর সমাধান হয়ে গেল। এখানে ভিলেনগুলো বোকা, গোয়েন্দা বেশি চালাক। মানে জটিলতার অভাব আছে। প্রচুর গোয়েন্দা গল্পে এমনটা আছে। সাহিত্যিক যিনি লিখছেন, তিনি মনে করেন শুধুমাত্র চটজলদি মনোরঞ্জনের জন্য এটা লেখা। এতে আমার আপত্তি আছে।

আমার কাছে গোয়েন্দা গল্প হলো ভাবানোর জন্য। একটা ভালো থ্রিলার ছবি ভাবায় লোককে। না ভাবালে শুধু মনোরঞ্জন করতে পারে না। ভাবতে হবে, এ খুন করেছে, না ও খুন করেছে, ভাবনার মধ্যে দিয়ে পাঠককে নিয়ে যেতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে, খুন এ-ও করতে পারে, ও-ও করতে পারে, সে-ও করতে পারে। পাঠক এক সময় নিজেই গোয়েন্দা হয়ে যাবে এবং এক সময় ভাবতে আরম্ভ করবে যে, কেন লোকটা এই কাজগুলো করছে? ক্ষমতা, টাকা, এসবের জন্য? যাই হোক এই যে সমাজের চেহারাটা বেরোচ্ছে, সেখানে পাঠকও ভাবছে। এই গোয়েন্দা গল্পগুলোই হল প্রকৃত উঁচুদরের সাহিত্য। যেটা পড়ে শুধু মনোরঞ্জন হয় না, একটা আকর্ষণও জন্মায়, সেখানে পাঠক একটা অধ্যায় থেকে পরের অধ্যায়ে তখনই যেতে চায়। কাল পড়ব বলে ফেলে রাখে না। অর্থাৎ একটা ভালো রোম্যান্টিক সিনেমা করার থেকে অনেক বেশি শক্ত একটা ভালো থ্রিলার করা। কোনো কিছুর মধ্যে যদি থ্রিলার এলিমেন্ট থাকে তাহলে সেটা সফল হয় বলে আমার ধারণা।

যে কোনো বড় মাপের সাহিত্যকে যদি আমরা দেখি... যদি হ্যামলেট দেখি, শেক্সপিয়ার দেখি, কী অন্য যাই দেখি, তার মধ্যে সেই এলিমেন্টটাই দেখব। কাকাকে খুন করবে কী করবে না? কীভাবে করবে? ম্যাকবেথ রাজা হওয়ার জন্য খুন করেছে, তাহলে

কী সে আবার খুন করবে? একটা প্রচ্ছন্ন থ্রিলার এলিমেন্ট থাকে। শুধু ডিটেকটিভ গল্পে না, একটা ভালো সাহিত্যেও থ্রিল থাকে। সিনেমার শেষে কী হবে সেটা যদি আগে জেনে ফেলি তাহলে সিনেমা দেখব কেন? সব কিছু না জানিয়েও বলতে পারার ক্ষমতা চলচ্চিত্রনির্মাতার থাকতে হবে, নয় তো সে একঘেয়ে ছবি বানিয়ে ফেলবে। যে কারণে অ্যালফ্রেড হিচকক একটা সময়ে ফ্রান্সের নব্যনির্মাতাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে আমাদের দেশের মানুষও, এমনকী, সত্যজিৎ রায়ও তাঁকে পছন্দ করেছিলেন। হিচকক থেকে কিন্তু অনেকে শিখেছেন। হিচকককে শিক্ষক স্বীকৃতি দিয়েছেন ত্রুফো, হিচককে স্বীকৃতি দিয়েছেন সবাই। একটা জিনিস হতে গিয়ে আরেকটা জিনিস হয়ে গেল...উনি তো সারাজীবন এটাই করেছেন। যে কোনো ভালো সিনেমায় বা যে কোনো ভালো গল্পে এটাই হবে।

শি : আপনি বলছেন তাহলে বড়ো মাপের কোনো সাহিত্যেও থ্রিল থাকে?

অ : আমার কাছে একটা বড়ো মাপের সাহিত্য মানে তাতে থ্রিল থাকবেই। এই থ্রিল না থাকলে যেমন ভালো গোয়েন্দা গল্প হয় না, তেমনই তাতে প্রেম বা যৌনতা না থাকলেও তা রসোত্তীর্ণ হয় না। যৌনতাকে অগ্রাহ্য করে, শুধুমাত্র কিশোর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প দিয়ে গোয়েন্দাকে বিচার করতে করতে গেছি বলেই হয়তো বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা গল্প তত উঁচু জাতে ওঠেনি, যে জায়গা থেকে আমি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'কে দেখছি একটা উঁচু মাপের সাহিত্য হিসেবে। এই যে প্রাপ্তমনস্ক চিন্তাভাবনা, গোয়েন্দা গল্পে তার অভাব রয়ে গেছে। কারণ তা নারীবর্জিত, কোনো সম্পর্কের জটিলতার কথা নেই।

বাংলা সাহিত্যে এই এতগুলো গোয়েন্দা, অথচ কেউ মদ খায় না কেন? আমার বুঝতে অসুবিধা হয়। শুধু সিগারেট খায়, চা খায়। অথচ অন্যান্য গল্পের নায়কেরা সবাই তো মদ খাচ্ছে, এটা করছে, সেটা করছে। গোয়েন্দা গল্পের নায়কেরা ভীষণ চরিত্রবান হয়, সাংঘাতিক চরিত্রবান। গোয়েন্দারা কখনোই সাংঘাতিক

চরিত্রবান হতে পারে না। যার জীবনে স্থিতি নেই, তার জীবনে কি শারীরিক চাহিদাও নেই? অবশ্যই আছে। তার শারীরিক চাহিদাগুলো সে অন্যভাবে মিটিয়ে নিচ্ছে। সেটা দেখাতে অসুবিধা কোথায়? বলতে অসুবিধা কোথায়? লিখতে অসুবিধা কোথায়? সেটাই তো ইন্টারেস্টিং। এই জিনিসগুলো আনতে পারলে আমার মনে হয় ভালো গোয়েন্দা গল্প হবে।

শি : এই যে গল্পগুলো আপনি লিখেছেন, সেখানেও নায়কের ক্ষেত্রে কি কোথাও গিয়ে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে?

অ : অবশ্যই। আমার গোয়েন্দা কোথাও গিয়ে খুনিকে ধরতে পারে, দুর্নীতির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, তার মধ্যে থাকা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যকে সে নিজের অধীনে রাখতে পারে। তার মানে এই নয় যে সে সাংঘাতিক একজন সন্ন্যাসী হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে তো ভুল করবে, নানান রকম ঝামেলার মধ্যে পড়বে, তাকে লোভের মুখোমুখিও দাঁড়াতে হবে। আমার সুব্রত শর্মা সব কিছুর মধ্যে দিয়ে গিয়ে দুঃখও পাবে, হেরেও যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়, বা সে তার এজেন্সির পাশেই দাঁড়ায়। তার কখনোই প্রচুর টাকা হবে না, বা সে প্রচুর টাকার কেস পাবে না। এজেন্সিগুলোর উপর আমি অনেক দিনের রিসার্চ করেই বলছি। কয়েকটা স্থূল কেস পাবে। যার সাম্মানিক কত হবে? পঁচিশ হাজার? চল্লিশ হাজার সর্বোচ্চ। কিন্তু এই স্থূল কেসগুলোই তাকে পৌঁছে দেবে ভয়ংকর জটিল পরিস্থিতিতে। যেখানে অসহিষ্ণু শ্রেণিবিভক্ত দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের চেহারাটা খুলে যাবে আস্তে আস্তে। এরকম একটি জায়গায় পৌঁছতে হবে।

আমার গোয়েন্দা সুব্রত এটা সচেতন ভাবে ধরিয়ে দিতে যাবে, ফলে তাকে মার খেতে হবে। তবুও সে বড়ো ধরনের একটা পাপকে চিহ্নিত করে নিশ্চিত করবে।

শি : মানে এখানে তার একটা বিবেকের ভূমিকাও আছে?

অ : হ্যাঁ, খানিকটা। কিন্তু বিবেক আছে বলে যে সে খুব একটা সাত্ত্বিক লোক... তা কিন্তু নয়।

শি : বুঝতে পারছি।

অ : এই যে তার জীবনের একটা সংগ্রাম, এটা কিন্তু তার কাছে একটা মজা। এখন যদি কেউ বলে সে এমন করছে কেন? কারণ নেশা। 'সত্য' খোঁজার নেশা। এর থেকে সে যেটা পাচ্ছে সেটা সস্তার রাম, অল্প দামের ডিম পাঁউরুটি, একটা অফিস, নিজের অফিসে নিজেই নিজের বস, আর কিছু বাজে কেস। এর জন্য সে একটা পাগলামি করে চলেছে,যা সাধারণ মানুষ করবে না। এর জন্য তাকে সাধারণ হয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু কোথাও ওর মধ্যে একটা অসাধারণ মানুষও আছে, যে জন্যে সে বলতে পারে, টাকাটা আমি নেব না, বা, কাউকে নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করে দিল... এমন।

প্রতিনিয়ত একটা সত্যের মুখোমুখি হতে হবে তাকে, একটা রাজনৈতিক সত্য। বিশাল সম্ভ্রান্ত কিছু একটা, শিক্ষা, মানবিকতা, রাজনৈতিক সচেতনতা, বনেদিয়ানা, এত কিছুর পিছনে কিন্তু একটা নোংরা প্রতারক সমাজ আছে। অর্থাৎ তাকে সমাজের সমালোচক হয়ে এইগুলো আমাদের দেখাতে হবে। ভালো গোয়েন্দা গল্প কিন্তু সমাজের সমালোচনা করে।

শি : আপনি তাহলে লেখক হিসেবে ছুঁতে চাইছেন এই সময়ের একজন অগোছালো মানুষকে...

অ : বেপরোয়া, বেপরোয়া লোক হতে হবে। একটু বাউন্ডুলে হতে হবে। আমার গোয়েন্দা হচ্ছে বেপরোয়া, বাউন্ডুলে, গোছানো নয়। খুব সাধারণ ও ভুলে-ভরা।

কথোপকথন : শিলাদিত্য সেন

সূচি


সামসিং থেকে
এক কিলোমিটার

আমার নাম সুব্রত শর্মা। বয়স উনচল্লিশ। নীল আমার সব থেকে প্রিয় রং। আর নীল আকাশের নিচে এই পৃথিবী। যাক্‌গে, আসল কথায় আসি।

কলকাতার একটা নামী বাংলা পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার ছিলাম। একটা বড়সড় পুলিশ-কেস নিয়ে লিখতে গিয়ে, পুলিশের কুকীর্তির কথা লিখে ফেলি। ওপর মহল থেকে চাপ আসে। আমার চাকরিটা চলে যায়। স্রেফ বাধ্য হয়েই কলকাতার একটা সস্তা ডিটেকটিভ এজেন্সিতে সেক্রেটারির চাকরি নিয়ে ঢুকি।

১১/১ ম্যাকলয়েড স্ট্রিট। একটা ঘিঞ্জি গলির ভেতরে, একটা পুরোনো বাড়ির দোতলায় আমাদের অফিস। ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি। আমার ছেষট্টি বছরের বস, ড্যানি ব্যানার্জি এক সময় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বড় চাকরি করতেন। কানাঘুষো যা শুনেছি তা হল মাত্র দশ হাজার টাকার ঘুষ নিতে গিয়ে তার চাকরিটা চলে যায়। তারপর এই এজেন্সি। বছরখানেক ধরে আছি। মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা কেস এসেছে। সকাল থেকে মদ্যপান করেন। গোয়েন্দারা কেন একটা সামাজিক প্রয়োজন তা নিয়ে বিস্তর জ্ঞান দিয়ে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক মুসলমান মহিলার বাড়ি চলে যায়। যাবার সময় একটাই কথা :

'বউ ফোন করলে বলবে আমি একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার কেস নিয়ে ব্যস্ত।'

তারপর পিঠে একটা ভালোবাসার থাপ্পড়।

'বোতলটা দেরাজে লুকিয়ে ফেলো।'

বউ কেন, কেউ ফোন করে না। যদিও বউ আমাদের অফিসের নিচের চা-ওয়ালাকে পয়সা দেয় তার স্বামীর ওপর স্পাইং করার জন্য।

দুপুরটা আমি নিজের চেয়ারে ঘুমিয়ে কাটাই। আশির দশকের পুরোনো

পাখা। কারেন্ট থাকলে সমুদ্রের মতো গর্জন এবং সমুদ্রের মতোই হাওয়া!

সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে একটা মোলায়েম ধাক্কা। আমাদের টাইপিস্ট রত্না।

'ওঠো। মনে হয় মক্কেল।'

'আরে বলে দাও বস নেই। পরে আসতে।'

'আরে অ্যাডভান্সটা অন্তত নাও। শোনো সুব্রতদা। দু'মাসের ইলেকট্রিসিটি বিল জমা পড়েনি। সামনের মাসে তোমার আমার মাইনেটাও জুটবে না। ওঠো।'

সাতাশ বছরের, রোগা, শ্যামলারঙের রত্না। বাবা হঠাৎ মারা যায় বলে কলেজ পাস করতে পারেনি। ওর দিকে বেশিক্ষণ তাকালে বুকের ভেতরে একটা বদহজমের, মিন মিন করা ব্যথা হয়।

মক্কেল একটা মেরুন শিফনের শাড়ি এবং লাল পেট কাটা ব্লাউজ পরে, লাল নেলপালিশ দেওয়া আঙুলগুলো এক করে। 'নমস্কার। আমার নাম পামেলা চৌধুরি বেশ কিছুদিন হল আমার স্বামী মিসিং।'

রত্না খাতা-পেন নিয়ে বসে পড়েছে, দায়িত্ব নিয়েছে।

'পুলিশে জানাননি?'

মহিলা তার খয়েরি রঙের চামড়ার হ্যান্ড ব্যাগ থেকে একটা সুপুরুষ ভদ্দরলোকের ছবি টেবিলে রেখে আমার দিকে ঠেলে দেন।

'সঞ্জয় সেন। আমার স্বামীর নাম। আসলে আমাদের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়। ও কলকাতায় চলে আসে...তারপর চার দিন আগে আমার বাবার কাছে একটা ফোন আসে। বলে সঞ্জয়কে ফেরত পেতে চাইলে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিতে হবে। পুলিশকে জানালে সঞ্জয়কে আর দেখতে পাব না।'

রত্না অ্যাডভান্স নিয়েই ছাড়বে।

'তাই পুলিশকে জানাননি?'

মহিলার চোখের কোণে জল কিংবা দুপুরের রোদ, কী একটা চিক চিক করে ওঠে।

'বাবা টাকাটা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে চান। আমি গতকাল কলকাতায় এসেছি। আজ রাতে এলিয়ট রোডের একটা গেস্ট হাউসে টাকাটা দিতে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম একাই যাব। এখন একটু ভয় করছে। দশ হাজার টাকা দিতে রাজি আছি। পাঁচ এখনই অ্যাডভান্স করে দেব। আপনি যদি আমার সঙ্গে একটু যান।'

পামেলা চৌধুরি কোথা থেকে কলকাতায় এসেছে সেটা জানার রত্নার কোনো প্রয়োজন নেই দেখে আমিই প্রসঙ্গটা তুললাম।

মহিলার বাবার রুদ্রশেখর চৌধুরির ডুয়ার্সে বিশাল চা বাগান আছে। মালবাজার থেকে দুই কিলোমিটার দূরে সামসিং যাওয়ার পথে এই দু'খানা টি এস্টেট প্রায় সত্তর বছরের পুরোনো। পামেলা চৌধুরি লন্ডনে ব্যার-অ্যাট-ল পাস করেন। ওখানেই সঞ্জয় সেনের সঙ্গে পরিচয়। দুজনে বিয়ে করে দেশে ফিরে আসে। সঞ্জয়বাবু তার শ্বশুরের ব্যবসার দায়িত্ব নেয়। পামেলা চায় বাবার কারবারে না ঢুকে কলকাতায় একটা ল ফার্ম খুলবে। সেই নিয়ে ঝগড়া। রাগ করে সঞ্জয়বাবু কলকাতা চলে আসেন। তারপরে অপহরণ!

রত্নার দায়িত্বজ্ঞান ফিরে আসে। পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে নেয়। কথা দেয় যে এজেন্সি পামেলা চৌধুরির সিকিউরিটির দায়িত্ব নেবেই! কাজ শেষ হলে আরও পাঁচ।

বিকেলের দিকে ড্যানি ফিরে আসে। আবার পিঠে ভালোবাসার থাপ্পড়। বলে; 'গুড ওয়ার্ক সুব্রত।' তবে দশ হাজারে হবে না। ওটা নাকি উনি দায়িত্ব নিয়ে বারো হাজার করে নেবেন। সঞ্জয় সেনের ছবিটা পকেটে গুঁজে নিয়ে অফিসের দেড়শো বছরের সিন্দুক খুলে তার থেকে পিস্তলটা আর ওর সানগ্লাসটা বার করে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'শোনো সুব্রত। অনেক ফালতু সময় নষ্ট করেছ, আজ থেকে তুমি আমার পার্টনার।'

পার্টনার শব্দের আক্ষরিক অর্থ হয় ব্যবসাকেন্দ্রিক, নয় জীবনের সঙ্গী। একজন ছেষট্টি বছরের মদ্যপ বুড়োর জীবনের সঙ্গী একজন উনচল্লিশ বছরের বাউন্ডুলে পুরুষ কী করে হয় সেটা বুঝিয়ে বলার জন্যই এই গপ্পোটা লিখতে শুরু করেছিলাম। এক্ষুনি পারছি না। কিন্তু গল্পে যখন ঢুকেই পড়েছি তখন দেখা যাক সেটার গুরুত্ব এই গল্পে কতটা।

'শোনো সুব্রত। বাড়ি যাও। রাত আটটার মধ্যে চলে আসবে। সারা রাত অফিসেই থাকবে। ঘুমোবে না। মহিলাকে নিয়ে আমি ঠিক রাত বারোটা নাগাদ ওই গেস্ট হাউসে যাব।'

বাঁ হাতে, অনেকটা ষাট-এর দশকের 'হলিউড সিনেমার' নায়কদের মতো, একটা ভিজিটিং কার্ড আমার টেবিলে ছুড়ে দেয়।

'এতে পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি গাঙ্গুলির ফোন নম্বর আছে। রাত একটার, মধ্যে

যদি তোমাকে আমি ফোন না করি। তুমি গাঙ্গুলিকে ফোন করবে। আমার নাম বলবে। তাকে নিয়ে ওই এলিয়ট রোডের গেস্ট হাউসে চলে আসবে। বুঝেছ?'

আমাদের অফিসে ষাট-এর দশকের একটা প্রচণ্ড জনপ্রিয় 'হলিউড সিনেমার' ছবির পোস্টার ড্যানি কেন বাঁধিয়ে রেখেছে আমি আজও বুঝিনি। একটা ডিটেকটিভ সিনেমার ছবি। নাম 'মলটিজ ফ্যালকন'! নায়ক হ্যামফ্রি বোগার্ট-এর হ্যাট পরা একটা ছবি। পোস্টারের লাল রঙটা ঝলসে গিয়ে আজ খয়েরি হয়ে গেছে! কিন্তু পোস্টারের মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়া আছে। অর্থাৎ দুম করে দেখলে, থমকে যেতে হবেই।

রাত সোওয়া আটটা নাগাদ আমি একটা সস্তার রামের নিপ পকেটে নিয়ে অফিসে ঢুকে পড়ি। সেটা পুরোটা, গোটা দশেক সস্তার সিগারেট, আর সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে আমি আমার চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ি।

ড্যানির ফোন আসেনি। খুব ভোরের দিকে আমার সেল ফোনটা ধড়মড় করে উঠেছিল।

'গাঙ্গুলি বলছি, পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে। আপনি সুব্রতবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'শুনুন, ড্যানি মারা গেছে।'

দুই

চাপ চাপ লালচে কালো রক্তের ওপর ড্যানির লাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগে মদ্যপ অবস্থায় ড্যানি ব্যানার্জির প্রশ্ন, 'তুমি তো ক্রাইম রিপোর্টার। লাশ দেখার অভ্যেস আছে?'

এলিয়ট রোডের সস্তার গেস্ট হাউসের ঘুপচি ঘরে দোরগোড়ায় ড্যানির লাশ। মুখটা সামান্য ফাঁক করা। অনেকটা অসহায় শিশুর মতো কী বলতে চাইছে, বোঝাতে পারছে না। তার বুক পকেটের ঠিক নিচে একটা গুলির ক্ষত। কিছু দূরে একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে আছে, আমারই বয়সি একজন সুপুরুষ। যার মুখের সঙ্গে পামেলা চৌধুরির দেওয়া ছবিটার হুবহু মিল। সঞ্জয় সেন।

পার্ক স্ট্রিট থানার সব কোলাহল ছাপিয়ে একটা কড়া প্রশ্ন, 'আপনি কি ড্যানির পার্টনার?

'না সেক্রেটারি!'

ওসি গাঙ্গুলি এক এক করে তার টেবিলে রেখেছিলেন। ড্যানির পিস্তল, তার সানগ্লাস তার মানিব্যাগ, সেল ফোন!

'লাশ পোস্টমর্টেমে যাবে। বডি ছাড়লে সৎকার করবেন। ওর বাড়িতে খবর দিন। চাকরিটা তো থাকছে না।'

আমি কেন জানি না হাত বাড়িয়ে ড্যানির সানগ্লাসটাই প্রথমে তুলে নিয়েছিলাম।

গাঙ্গুলির বয়স পঞ্চাশ হবে। তার গোঁফের অসম্ভব যত্ন নেন সেটা তখন খেয়াল করিনি। আজ জানি। কণ্ঠস্বর অনেকটা অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখার্জির মতো।

'ড্যানির ফোন থেকে আপনার নম্বরটা পাই।'

দুই

চাপ চাপ লালচে কালো রক্তের ওপর ড্যানির লাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগে মদ্যপ অবস্থায় ড্যানি ব্যানার্জির প্রশ্ন, 'তুমি তো ক্রাইম রিপোর্টার। লাশ দেখার অভ্যেস আছে?'

এলিয়ট রোডের সস্তার গেস্ট হাউসের ঘুপচি ঘরে দোরগোড়ায় ড্যানির লাশ। মুখটা সামান্য ফাঁক করা। অনেকটা অসহায় শিশুর মতো কী বলতে চাইছে, বোঝাতে পারছে না। তার বুক পকেটের ঠিক নিচে একটা গুলির ক্ষত। কিছু দূরে একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে আছে, আমারই বয়সি একজন সুপুরুষ। যার মুখের সঙ্গে পামেলা চৌধুরির দেওয়া ছবিটার হুবহু মিল। সঞ্জয় সেন।

পার্ক স্ট্রিট থানার সব কোলাহল ছাপিয়ে একটা কড়া প্রশ্ন, 'আপনি কি ড্যানির পার্টনার?

'না সেক্রেটারি!'

ওসি গাঙ্গুলি এক এক করে তার টেবিলে রেখেছিলেন। ড্যানির পিস্তল, তার সানগ্লাস তার মানিব্যাগ, সেল ফোন!

'লাশ পোস্টমর্টেমে যাবে। বডি ছাড়লে সৎকার করবেন। ওর বাড়িতে খবর দিন। চাকরিটা তো থাকছে না।'

আমি কেন জানি না হাত বাড়িয়ে ড্যানির সানগ্লাসটাই প্রথমে তুলে নিয়েছিলাম।

গাঙ্গুলির বয়স পঞ্চাশ হবে। তার গোঁফের অসম্ভব যত্ন নেন সেটা তখন খেয়াল করিনি। আজ জানি। কণ্ঠস্বর অনেকটা অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখার্জির মতো।

'ড্যানির ফোন থেকে আপনার নম্বরটা পাই।'

মাঝরাতে, এলিয়ট রোডের গেস্ট হাউসের বাইরে, রাস্তায় কুলি-মজুররা গুলির শব্দ শুনে ওপরে উঠে যায়। তারপর পুলিশ ডাকে।

অফিসার গাঙ্গুলিকে চাকরি করার সময় ড্যানি খুব সাহায্য করে। অনেকটা দাদার মতো। তাই গাঙ্গুলিবাবু আমাকে খুব একটা হেনস্তা করেননি। পামেলা চৌধুরির ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ওঁর ধারণা, অপহরণকারীরা বুঝতে পারে পামেলা সঙ্গে সিকিউরিটি নিয়ে এসেছেন। ড্যানি যেরকম বেপরোয়া ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। ওরা ড্যানিকে খুন করে। তারপর সঞ্জয়বাবুকে। তারপর মহিলাকে এবং টাকা নিয়ে ভেগেছে। ঝামেলার কেস!

গাঙ্গুলি ওঁর ভিজিটিং কার্ডটা আমায় দেন।

বলেন প্রয়োজন পড়লে ফোন করতে এবং যখন তখন থানায় আসতে হতে পারে।

বৃষ্টি নেমেছিল। থেমে গিয়েছিল। ট্যাকসির উইন্ডস্ক্রিনের ভেতর দিয়ে ঝাপসা শহরটাকে দেখতে দেখতে কেন জানি না মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, অমিয়দা...জীবনে কত মানুষকে হারিয়েছি। কিন্তু একজন সস্তার গোয়েন্দা, আমার মদ্যপ, লম্পট বসের জন্য মনটা এত খারাপ হয়ে যাবে ভাবিনি। তাই, সকাল থেকে না খেয়ে অফিসে ফিরে এসে যখন দেখলাম ড্যানির স্ত্রী মালাদি এসে রত্নার ওপরে রাগারাগি করছে এবং ড্যানি কোথায় কী টাকা রেখে গেছে তার হিসেব চাইছে, মাথাটা গরম হয়ে গেল। ব্যাগ থেকে ড্যানির পিস্তল, সানগ্লাস, ফোন এবং পামেলা চৌধুরির দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা ড্যানির টেবিলে ফেলে দিলাম!

'নিয়ে যান! আপনার স্বামীর যা কিছু আছে এই দিয়ে দিলাম। এই তো ঘোড়ার ডিম আছে। নিয়ে যান।'

হঠাৎ কারেন্ট চলে যাওয়ার মতো, মালাদি থমকে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়েন।

'একটা মানুষের দেহ এখনও মর্গে পড়ে আছে। আপনার দেনা-পাওনা, সম্পত্তি বড় হয়ে গেল? এই অফিসে যা আছে, টেবিল, চেয়ার বাইরের সাইনবোর্ড সব বেচে দিন। যান। নিয়ে যান!'

বাংলা সিনেমার সংলাপের মতো শোনাল। রত্না ডুকরে কেঁদে উঠল। মালা ব্যানার্জি সময় নিয়ে, কথা বলতে বলতে ভেঙে পড়লেন।

'জানো সুব্রত, বাড়ি থেকে পালিয়ে ড্যানিকে বিয়ে করেছিলাম। ভেবেছিলাম সুখে সংসার গড়ব। ঘুষ নিয়ে, চাকরি হারিয়ে যখন আমার কাছে এসে বলল এজেন্সি খুলবে, আমার যাবতীয় সব গয়নাগাঁটি ওকে দিয়ে দিয়েছিলাম। সে ব্যবসা গোল্লায় গেছে। সে আমাকে ঠকিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের লায়লার সঙ্গে প্রেম করে যেত দিনের পর দিন...

পাটভাঙা তাঁতের শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছলেন। কিন্তু জল থামল না।

'তোমরা যা করার করো। আমার কিচ্ছু চাই না। তবে ড্যানিকে হিন্দু মতে সৎকার কোরো। ওর বাবা হিন্দু ছিলেন।'

মালাদি চলে গেলেন। রেখে গেলেন একটা ক্লান্ত ছাদ যেখানে ঘুড়ি ওড়াতে ইচ্ছে করে না।....

'আসতে পারি?'

আবার সেই কড়া পারফিউম আর নেলপালিশের অ্যান্টিসেপটিক মেশানো একটা অদ্ভুত গন্ধ।

পামেলা চৌধুরির অফিসের দরজার কাছে সেই মেরুন রঙের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটু চোটের দাগ। আমি সিগারেটটা ধরাতে গিয়েও ধরলাম না। উনি ঢুকে এসে চেয়ারে বসলেন। তার খয়েরি রঙের চামড়ার হ্যান্ড ব্যাগ থেকে, কিছু টাকা বার করে টেবিলে রাখলেন। বিকেলের সূর্য বেশ অনেকক্ষণ আগে আমাদের ম্যাকলয়েড স্ট্রিট থেকে বিদায় জানিয়েছে। রত্না বাড়ি চলে গেছে।

'আপনাদের বাকি টাকাটা।'

মাথার ওপর সমুদ্রের হাওয়া।

'আমি অনেকবার বলেছিলাম ওঁকে ঘরে না ঢুকতে। উনি দুম করে ঢুকে পড়লেন। পিস্তল বার করলেন। ওরা অন্ধকার থেকে গুলি চালাল। তারপর সঞ্জয়কেও গুলি করল। তারপর টাকা ভর্তি ব্যাগ এবং আমাকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ....তারপর আর মনে নেই। জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাছে পড়ে আছি। তাজ বেঙ্গলে যাই....তারপর আমার হোটেলে।

জানালার বাইরে রাস্তার হ্যালোজেনগুলো জ্বলতে শুরু করেছে।

'আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?'

পামেলা চৌধুরি একটা বিলিতি সিগারেট বার করলেন। আমি আমার সস্তার দিশি লাইটারটা জ্বালালাম। পাশের বাড়ির বুড়ো স্যামুয়েল মদ্যপান করে তার ট্রাম্পেট বাজাতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে সন্ধের আজান। পামেলার চোখে জল বাড়ছে।

'জানেন সুব্রতবাবু আমার জীবনটা বড্ড ঘাঁটা। সঞ্জয় বাবার ব্যবসার দায়িত্বটা নেবার পর কেমন বদলে গিয়েছিল। আগে অনেকবার কলকাতায় এসেছে, ব্যবসার জন্য। পরে জানলাম ওর এক বান্ধবী আছে।'

ড্যানি মারা গেছে। কেস খতম। টাকাও পেয়ে গেছি। কথা বাড়াবার প্রয়োজন নেই। তবুও প্রশ্নটা করলাম।

'ওদের কাউকে চিনতে পেরেছেন?'

'না। তবে একজন মহিলা ছিল।'

স্যামুয়েলের ট্র্যাম্পেটের বাজনা বাড়ছে আর আমাদের অফিসঘরের অন্ধকার।

'সুব্রতবাবু, আপনি আমার জন্য আর একটা সাহায্য করে দেবেন?'

'কী?'

'একবার সামসিং যাবেন। মানে বাবাকে কী বলব বুঝতে পারছি না। আপনি যদি একবার গিয়ে ওঁকে বোঝান। এর জন্য আপনাকে আমি পারিশ্রমিক দেব। কুড়ি হাজার।'

'আমি কী বলব? আমি তো কিছুই দেখিনি!'

পামেলা চৌধুরির গালে ধেবড়ে যাওয়া মাসকারার জল। একটা অসহায় নীরবতা। স্যামুয়েল বাজাচ্ছে তার ট্র্যাম্পেট পাশের বাড়ি।

'কেন জানি না, আপনাকে বিশ্বাস করে ফেলেছি। ...তাই রিকোয়েস্ট করলাম... সরি।'

উঠতে গিয়ে পামেলা চৌধুরি বেশ ভালোই টলে যান। কোমরে টেবিলের খোঁচা অগ্রাহ্য করে তাকে ধরে না ফেললে হয়তো মাটিতে পড়ে যেতেন। শিফন শাড়ির মধ্যে দিয়ে তার নরম শরীরটা যখন জাপটে ধরেছিলাম তখন স্যামুয়েলের ট্র্যাম্পেট তুঙ্গে। ওই কয়েক সেকেন্ড আমার জীবনের সব কিছুর থেকে একটু অন্যরকম এটুকু বলতে পারি।

ওঁকে যত্ন করে চেয়ারে বসিয়ে, টেবিলের জলের গেলাসটা ওঁর ঠোঁটের লাল লিপস্টিকের দিকে এগিয়ে দিই।

চাকরি নেই। হঠাৎ ড্যানির মৃত্যু। হাতে কিছু টাকা এলে মন্দ হয় না। একজন সুন্দরী, অসহায় মহিলা আমার সাহায্য চাইছে। ...আমার বড্ড একা লেগেছিল।

'বেশ যাব। এখনি তো যাওয়া যাবে না। আগে একটু গুছিয়ে নিই।'

'বেশ আপনি কবে যাবেন আমাকে ফোন করে জানাবেন। আমি এয়ার ফেয়ার, হোটেল, অ্যাডভান্স সব ব্যবস্থা করে দেব।'

আমার জ্যাঠামশাইয়ের রেখে যাওয়া ডাক্তার লেনে, আমার বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত হয়ে গিয়েছিল। চারতলা পুরোনো বাড়ি। এক গুচ্ছের ভাড়াটেদের সঙ্গে মামলা করে আমার জ্যাঠা গত হয়েছে। তারা এখন দিব্যি রেন্ট কন্ট্রোলে ভাড়া দেয়। বাপ-মা হারানো এই সুব্রত শর্মাকে জ্যাঠা তার চারতলার ফ্ল্যাটটা দিয়ে যায়। তার খুব শখ ছিল তার ভাইপো তার থেকেও বড় উকিল হবে। জোর করে ল' কলেজে ভর্তি করে দেন।

সকাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি। কোনোমতে চান করে, সবে তৃতীয় পেগ রামটা ঢালতে যাব। মালতীমাসি আমার ঢাকা দেওয়া খাবারের স্টিলের প্লেটটা একটু বেশি জোরেই টেবিলে রাখল।

'শোনো বাপু খেতে হলে খাও নইলে ফেলে দাও। আমি বেরোলুম। কাল সকালে শেতলা পুজো। আমায় দেশে যেতে হবে।'

'বেশ যাও।'

'যাব মানে? মাইনেটা কে দেবে শুনি? তোমার জ্যাঠা?'

ড্যানির বাকি টাকাটা ম্যানি ব্যাগে এখনও রয়েছে। বারান্দার হাতলে হেলান দিয়ে, ওই অনেকটা আমাদের অফিসের হলিউডের ছবির নায়কের মতোই বললাম, 'ম্যানি ব্যাগে আছে। যা নেবার নাও। কাটো।'

'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

মালতীমাসি যত্ন করে ব্যাগ থেকে টাকাটা বার করে নেয়।

'আর মদ খেও না। কিছু মুখে দাও। চলি।'

আমার জ্যাঠার খুব শখ ছিল তার ভাইপো বড় ব্যারিস্টার হয়ে বাড়িতে একটা লাল টুকটুকে বউ আর সাদা মারুতি গাড়ি বাড়ি নিয়ে আসবে। লিভার সিরোসিসে মারা যান। মরার আগে আমার হাত দুটো ধরে বলেছিল, 'বাবা, এই বংশের মুখ উজ্জ্বল করিস।' তিনি যদি জানতেন, তার ভাইপো ল' পাস করে, একটা সস্তার গোয়েন্দার এজেন্সিতে চাকরি করে, মেদিনীপুরের

মালতীমাসির হাতের আটপোড়া রুটি আর ডিমের কারি খেয়ে দিন কাটাবে তাহলে ছাদ থেকে লাথি মেরে ফেলে দিতেন।

ঘরের দরজাটা চমকে ওঠে। সবেমাত্র পেঁয়াজে একটা কামড় দিয়েছি।

ঘরের টিউব লাইটটার গ্যাস কমে গেছে। তাই লোকটার মুখটা ভালো করে দেখতে পাইনি। হবে হাতের পিস্তলটা উলটো করে ধরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি।

সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসে, যেন এখানেই থাকবে। 'শালা সস্তার টিকটিকি। মালবাজারে পা রাখলে কেটে রেখে দেব।'

তার হাতের রিভলভার-এর বাঁটটা উঠেছিল। আর কিছু মনে নেই। একটা সাদা, জ্বলন্ত যন্ত্রণা।

তিন

রুদ্রশেখর চৌধুরির লম্বা, পেটানো শরীর যতই ড্রেসিং গাউন দিয়ে ঢেকে রাখা হোক, তাঁর চিবুক প্রমাণ করে তিনি বোকামিকে প্রশ্রয় দেন না। তাঁর হুইস্কির গেলাসটা নামিয়ে সোজা আমার চোখের দিকে তাকালেন।

'আপনি যে কথাগুলো বললেন তা অনেকটাই আমার জানা। পুলিশ আমাকে বলেছে। এই জানা কথাগুলো এতদূর এসে আমাকে জানাবার জন্য আমার মেয়ে আপনাকে কত টাকা দিয়েছে?'

আমি সত্যি কথা বললাম। তার ডান দিকের ভুরুটা বেশ অনেকটাই কুঁচকে গেল।

'কুড়ি হাজার? প্লাস হোটেল ভাড়া, ফ্লাইটের ভাড়া...?'

ড্যানির না ছিল চিবুক। না চোয়াল। তবুও বললাম 'আপনাদের জন্য কাজ করতে গিয়ে আমার বস মারা গেছে রুদ্রবাবু।' একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক কথা।

রুদ্রবাবু চোখ নামালেন। হুইস্কি খেলেন।

'বেশ, আমি তাহলে আপনাকে একটা কাউন্টার অফার দিচ্ছি। পঞ্চাশ হাজার টাকা। আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে কে আমার জামাইকে কিডন্যাপ করে, খুন করেছে। এখানে থেকে করতে চাইলে করতে পারেন। আপনার হাত খরচা হোটেল ভাড়া, আর যাবতীয় আমি আলাদা দেব। তবে বিলগুলো রাখবেন।

রুদ্রশেখর চৌধুরির চা বাগান, মালবাজার থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। সামসিংয়ের কাছে। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে পৌঁছতে লাগে ঠিক তিন ঘণ্টা।

তখন সন্ধে সাতটা তবুও ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। তার বাংলো বাড়ির বাইরে সবটাই অন্ধকার। তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মোটাসোটা লোক মাথা চুলকোচ্ছে অনেকক্ষণ। দেখলেই মনে হয় বোকা।

তিনি ওঁর চা বাগানের ম্যানেজার। নাম প্রমোদ মিশ্র। এবং কতটা বোকা সেটা আমার গল্প বলবে।

রুদ্রবাবু আমার দিকে আবার তাকালেন।

'আমার লোক। প্রমোদ, আপনাকে কাল আপনার হোটেলে গিয়ে একটা অ্যাডভান্স করে দেবে। যদি গোয়েন্দা হয়েই থাকেন তাহলে টাকাটা অ্যাকসেপ্ট করবেন। নইলে, আমার মেয়ের কুড়ি হাজার নিয়ে পত্রপাঠ...!'

আমাদের অফিসের বস মৃত এবং আমার রোজগার নেই। রুদ্রবাবুর থুতনি আছে, আমার বসের ছিল না। রুদ্রবাবুর অনেক টাকা। ড্যানির অসহায় মৃত লাশ মনে পড়ে গেল। ...হঠাৎ কী হল, বলে ফেললাম, 'কতদিন সময় দেবেন?'

রুদ্রবাবুর থুতনিটা শক্ত হয়ে গেল।

'অনির্দিষ্টকালের জন্য নয়। তিন, চার দিন?

আমি কোনোদিন গোয়েন্দা হবার স্বপ্নও দেখিনি।

বললাম, 'বেশ। ঠিক আছে।'

ওঁর বোকা ম্যানেজার, প্রমোদ মিত্র আমাকে তার গাড়ি করে পামেলা চৌধুরির বুক করা হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিল। রাস্তায় কোনো কথা হয়নি। অন্ধকারে ডুয়ার্সের ঝিঁঝির ডাক আর অদূরে কোথাও মেঘের গর্জন।

হোটেলের নরম বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমার মালবাজারের দোকান থেকে কেনা সস্তার দামের নিবটা শেষ করলাম। কড়া সরষের তেলেভাজা মুরগির রোস্ট আর পরোটা, হোটেলের বেয়ারা কখন আমার ঘরে এসে টেবিলে রেখে গিয়েছিল আমার মনে নেই।

ড্যানি ব্যানার্জি কখন আমার খাটে বসে বলেছিল খেয়াল করিনি। শান্ত গলায় বলেছিল, 'আমি জানতাম তুমি গোয়েন্দা হবার সুযোগটা ছাড়বে না। তাই তোমাকে 'পার্টনার' বলে ডেকেছি।' আমি কিছু বলার আগেই ও বলেছিল, 'তুমি বুদ্ধিমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কলকাতা থেকে আমার পিস্তল আর সানগ্লাস ছাড়া আর একটা জিনিস তোমার সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ। সেটা কী?' আমি বলেছিলাম, 'আপনার স্মৃতি!' ড্যানি মুচকি হেসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'স্মৃতি কোনো কাজে লাগবে না যতক্ষণ না তুমি সেটার ছবি তুলে রাখছ বা রেকর্ড করছ।'

তারপর তড়াক করে খাট থেকে উঠে গিয়ে জানালার বাইরে গিয়ে বলেছিল, 'ঠিক সময় মনে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়ো।' আমি বিছানায় উঠে বসে বুঝি স্বপ্ন দেখছিলাম বাইরে রাত বেড়েছে। আকাশে অজস্র তারা। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

চার

আমার হোটেলের ঘরের জানলার ঠিক বাইরে জলঢাকা নদী অজস্র নানা সাইজের পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে ছুটছে। আমার দেরি করে ওঠার অভ্যেস। চা বাগানের জন্য খ্যাত এলাকার তিন কাপ ভয়ংকর তেতো চা আর দুটো সিগারেট শেষ করতে না করতেই বোকা ম্যানেজার আমার দরজায়।

'আসতি পারি?'

একটা বেশ মোটা খাম আমার বিছানায় রাখলেন।

'রুদ্রবাবু পঁচিশ হাজার অ্যাডভান্স পাঠিয়ে দিলেন। বাইরে আমার গাড়ি নিয়ে আছি। আপনি যেখানে যেতে চান বলবেন।'

সঞ্জয় সেনের বাগানের অফিসে ফাইলপত্তর না ঘেঁটে, বোকা ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করেই অনেকটা জানা গেল। চা বাগান ছাড়া রুদ্রবাবুর আরও নানা ব্যবসা আছে। দুটো পেট্রোল প্যাম্প যেটা চালায় অজয় রাই। একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি যেটা বহুদিন বন্ধ। একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি যার মালিক ভুবন প্রধান। তিনিও মৃত। একটা কাঠগোলা যেটার মালিক কুমুদ সাহা। এছাড়া পোলট্রি ফার্মিং আছে। সেটাও বন্ধ। অজয় রাই-এর পেট্রোল পাম্প দেখলাম, সেটাও বন্ধ। প্রমোদবাবু গলা খাটো করে নিজেকে একটু চালাক প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, 'এই অজয় রাই-এর একটা ইয়ের ঠেকও আছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিশি না বিদেশি?'

বললেন; 'সব। তবে ইয়ে...।'

'বেআইনি?'

'মানে...এটা আমি বলেছি সেটা আবার বড় সাহেবকে বলবেন না। আপনি লাঞ্চটা কোথায় খাবেন?'

রুদ্রবাবুর নানান ব্যবসা ঘুরে দেখে মনে হল যে কোনো ব্যবসাই তেমন

রমরমা করে চলছে না। সঞ্জয়বাবুর অফিসের ফাইলগুলো ঘেঁটে যা বুঝলাম যে চা বাগান ছাড়া কোনো ব্যবসায় মুনাফা তো নেই। বরং চূড়ান্ত লস।...

একটা মেঘলা দুপুরবেলা, ড্যানি হঠাৎ অফিসে এসে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'জীবনে কাউকে চট করে বিশ্বাস করবে না সুব্রত। আমি বললাম এটা একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি। এটা আমার ডিটেকটিভ এজেন্সি হয়ে গেল? আরে ভাই এটা তো আমার মদ খাওয়ার ঠেক হতে পারে। বউয়ের পয়সায় অসভ্যতা করার একটা ফ্রন্ট অফিস হতে পারে? পারে তো?'

সঞ্জয় সেনের গুমোট অফিসটাতে বসে থাকতে থাকতে, আর ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে মনে হল যে এই যে পেট্রোল পাম্প, কাঠগোলা, ট্রান্সপোর্ট, পোলট্রি ফার্ম,এগুলো কোনোটাই হয়তো ব্যবসা নয়। সবগুলোই ভুয়ো। ফ্রন্ট অফিস। বোকা ম্যানেজার হঠাৎ ঢুকে পড়ে আমাকে আর ভাবতে দিলেন না।

'থানার লাহাবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। যাবেন?'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়লাম।

জীবনে অনেক ভুল করেছি। ল' কলেজে পড়ার সময় একটি বড়লোকের মেয়ে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি পাত্তা দিইনি। জ্যাঠামশাইয়ের কথামতো একটা ভালো উকিল হতে পারতাম। হইনি। ড্যানি ব্যানার্জির পিস্তলটা কলকাতা থেকে সঙ্গে নিয়ে আসা সত্ত্বেও, হোটেলে ফেলে রেখে এসেছিলাম।

প্রায় আমাদের গাড়ির গা ঘেঁষে একটা মাহিন্দ্রা জিপ আমাদের ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করে, একেবারে সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বোকা ম্যানেজার চূড়ান্ত ভালো ড্রাইভার তাই হ্যান্ড ব্রেক চাপলেন। আমি হুমড়ি খেয়ে ড্যাশবোর্ডে মুখ থুবড়ে পড়লাম। কোনোমতে নামার আগেই, সামনের গাড়ি থেকে একজন লোক নেমে সোজা আমার দিকে চলে এল। কলকাতায় তার মুখটা স্পষ্ট দেখিনি, এবার দেখলাম। আমার কলার ধরে হিঁচড়ে নামাতে গিয়ে কলারটা ছিঁড়ে দিল।

'নাম। অজয় রাই। কলকাতায় মাথায় মেরেছি, এখানে নাকটা কেটে দেব। তারপর পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেব।'

আমি ওকে আশ্বাস দিলাম যে আমি জানি যে তার পেট্রোল পাম্পে

পেট্রোলের অভাব নেই। উত্তরে তলপেটে একটা ঘুষি। আমি হাঁটুদুটো তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেলেছিলাম বলে বসে পড়ি, কিন্তু মাথাটা গাড়ির দরজায় বেশ জোরেই ঠুকে যায়।

আমি ওঠার চেষ্টা করিনি কারণ অজয় রাই নিচু হয়। প্রায় ম্যাজিকের মতো ওর হাতে একটা ছুরি চলে আসে।

'টাকা ফেরত দিন। ডাক্তার দেখান।'

ছুরিটা তুলেছিল কি না জানি না। কারণ নাকের ভেতরে একটা বেগুনি রংয়ের ব্যথা আমাকে অন্ধ করে দেয়।...

পাঁচ

বোকা ম্যানেজার গাড়িটা ভালোই চালান, কিন্তু রাস্তা খারাপ বলে বেশ ঝাঁকুনি হচ্ছিল। স্থানীয় ডিসপেনসারিতে গিয়ে নাকে একটা ব্যান্ডেজ করার দৌলতে ব্যথাটা বেগুনি থেকে এখন গোলাপি হয়ে গেছে।

প্রমোদবাবু বকে চলেছেন, 'আরে মশাই এরা খতরনাক লোক। আরও খারাপ কিছু হতে পারত। কী করে যে এরা সাহেবের ব্যবসায় ঢুকল, ভগবান জানে। আমি তো নিজে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি।'

আমি চোখ বুজেই বললাম, 'সাহেব জানে এরা খতরনাক?'

'সাহেবের বয়স হয়েছে, তাই সব ব্যাপারে মাথা ঘামান না। সঞ্জয়বাবু জানতেন। আপনি থানায় যাবেন তো?'

'না।'

'আমার মনে হয় আপনি হোটেলে ফিরে গিয়ে একটু রেস্ট নিন। আমি লাহাবাবুকে জানাই ব্যাপারটা।'

'আমি অজয় রাইয়ের মদের ঠেকে যাব।'

'অ্যাঁ? এই অবস্থায়? ওটা অত্যন্ত সাংঘাতিক জায়গা। আপনার রেস্ট নেওয়া দরকার।'

'আমার মদ খাওয়া দরকার। আমি মদ খাব। আপনি গাড়িতে বসে থাকবেন।'

সাংঘাতিক জায়গাটা, সামসিং থেকে তিন কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তার, একটু নিচে নেমে গিয়ে, মূর্তি নদীর পাশে একটা কাঠের বাড়ির পেছনে একচিলতে খোলা উঠোন। নীল প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা। দু'চারটে প্লাস্টিকের টেবিল, আর গোটা আষ্টেক চেয়ার। অজস্র বন মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন স্থানীয় নেপালি একটা টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। তার মাথার সামনে একটা স্থানীয় মদ, রক্সির খালি বোতল। আমি গাড়ি থেকে থেমে একটা চেয়ার

টেনে বসি। একজন রোগা, অল্পবয়সি নেপালি আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমি সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে বলি, 'রাম আছে?' ছেলেটি স্পষ্ট বাংলায় বলে, 'রাম নেই স্যার।' 'তাহলে রক্সি?'

ছেলেটি যাবার আগেই আমি ড্যানি ব্যানার্জির কালো চশমাটা বার করে পরে নিয়ে বলি, 'ম্যানেজার আছে?'

'ম্যানেজার নেই। এখানে মালিকই সব।'

'খুব ভালো, তাহলে মালিককেই ডেকে আনো। না থাকলে, ফোন করে বলো কলকাতা থেকে একজন সাংবাদিক এসেছে, যে তার এই বেআইনি মদের ঠেক নিয়ে একটা লেখা লিখবে। কী হল? ফোন নেই?'...

একদিন সকালে অফিসে ঢুকে দেখি, ড্যানি তার চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে হুইস্কি খাচ্ছে। তার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ।

'কী হয়েছে স্যার?'

ড্যানি, নির্লিপ্তভাবে, আমার দিকে না তাকিয়েই বলেছিল, 'বুঝলে সুব্রত, কেউ যদি কোনোদিন গায়ে পড়ে তোমায় অ্যাটাক করে তাহলে বুঝবে সে ভয় পেয়েছে। সুতরাং, অ্যাটাক ব্যাক।'

অজয় রাইয়ের ঠেকে বনমুরগিরা ক্রমাগত ডেকে চলেছে। হতভম্ব নেপালি ছেলেটা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। আমি নিজের সেল ফোনটা বার করি।

'বেশ, আমিই ফোন করছি।' বলে আমি ডায়াল করি।

'হ্যালো, গাঙ্গুলিবাবু?'

ওপাশ থেকে সেই পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি'র জ্ঞানেশ মুখার্জি মার্কা গলা, 'কে বলছেন?'

'আমি সুব্রত বলছি স্যার। সুব্রত শর্মা। হ্যাঁ, ড্যানি ব্যানার্জির অফিসের। আপনাকে একটু বিরক্ত করছি। আমি একটু সামসিং-এ এসেছি। মানে মালবাজারের কাছে...উত্তরবঙ্গ। তা, এখানে এক স্থানীয় গুন্ডা, যার নাম অজয় রাই, একটা বেআইনি মদের ঠেক চালায়। আরও, নানান সব কুকর্ম করে বেড়ায়। আমার বিশ্বাস, সঞ্জয় সেনের খুনের পেছনে এর হাত আছে। তাই শিলিগুড়ির ডিএসপি সাহেবের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করতে চাইছি। আপনি কি যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন ওঁর সঙ্গে?'

'আরে আমাকে না জানিয়ে আপনি দুম করে ওখানে চলে গেলেন?'

'আসলে সুকনা টি-এস্টেটের মালিক রুদ্রশেখর চৌধুরি আমাকে ডেকে পাঠান। এসে দেখি এইসব ব্যাপার। শিলিগুড়ির মন্ত্রী গৌতমবাবু আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ না করে পুলিশের সঙ্গেই যোগাযোগ করা উচিত, তাই আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'ঠিক আছে, আপনি আমাকে পনেরো, কুড়ি মিনিট দিন। আমি মালবাজার থানার আইসি-র সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি।'

ওখানে ধন্যবাদ জানিয়ে, ফোনটা বন্ধ করে, সিগারেটটা ফেলে, ওই হাঁ করে থাকা নেপালি ছেলেটার দিকে তাকালাম।

'তোমার ম্যানেজার অজয় রাইকে বলো, আমি রকি আইল্যান্ড হোটেলে উঠেছি। নাম সুব্রত শর্মা। ওখানে আজ সন্ধের মধ্যে চলে আসতে। মালটা ওখানেই খাব।' উঠে পড়লাম।

'চলুন প্রমোদবাবু!'

বোকা ম্যানেজার বেশ হতভম্ব। বনমুরগিগুলো চুপ করে গেছে। আমি গাড়িতে উঠে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলাম। নাকের ভেতরের ব্যথাটা গোলাপি থেকে আরও ফিকে হয়ে গেছে। মনের ভেতরে একটা অচেনা প্রশান্তি। গাড়ির বাইরের জগৎটা একটা লম্বা হাই তুলতে গিয়ে থমকে গেছে। গাড়ির ইঞ্জিনও সময় নিল, স্টার্ট হতে।

হোটেলের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম দরজাটা খোলা। ড্যানি ব্যানার্জির পিস্তলটা ঘরের ভেতরে।

ছয়

ঘরের ভেতরে, জানলার সামনে, পেছন ফিরে, বাইরের জলঢাকা নদীর দিকে তাকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে পামেলা চৌধুরি। মেরুন রঙের সিল্কের শার্ট আর কালো প্যান্ট পরে। মেরুন রং সে ছাড়ছে না। আমাকে ছাড়ছে না তার নখের লাল নেলপালিশের অ্যান্টিসেপটিক গন্ধ।

'অন্যের ঘরে তালা খোলার অভ্যেস আছে, জানতাম না!'

পামেলা ঘুরে তাকায়। চোখে ক্লান্তি।

'বললাম আমি আপনার স্ত্রী। ঢুকতে দিয়ে দিল।'

আমি না ভেবেই বলি, 'বুকিংটা তো আপনার নামেই করা।'

'সবই যখন জানেন তখন অবান্তর প্রশ্ন করছেন কেন? নাকে কী হল?'

আমি এগিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম।

'পরের ব্যাপারে নাক গলাতে গেলে যা হয়।'

'তাহলে নাক গলাতে যাচ্ছেন কেন?'

'আপনার বাবা আমাকে টাকা দিয়ে নিযুক্ত করেছেন।'

পামেলার চোখের ক্লান্তি এবার অভিমানে পরিণত হল।

'জানি। আমার বাবা আপনাকে নিযুক্ত করেছেন তার জামাইয়ের খুনিকে খুঁজে বার করার জন্য। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো কেউ যদি তার জামাইকে ছেলের মতো ভালোবাসে, তার ছেলের দাম পঞ্চাশ হাজার?'

আমি পামেলার দিকে তাকিয়েই ছিলাম। 'আপনার কাছে আপনার স্বামীর দাম ছিল পঞ্চাশ লাখ। আপনার বাবারই টাকা।'

পামেলা তার সিগারেটটা জানলার বাইরে ফেলে দেয় আলতো করে। তার চোখের অভিমান এখন অনেক ঠান্ডা।

'আমি শুধু আমার কর্তব্য করতে গিয়েছিলাম। সঞ্জয়কে ফিরিয়ে আনতে।

আপনি ভালো করেই জানেন সে আমাকে ঠকাচ্ছিল। তার কলকাতার বান্ধবী ছিল এই কিডন্যাপারদের দলে।'

আমি মুখ ঘুরিয়ে জানলার বাইরে, জলঢাকা নদীর স্রোতের দিকে তাকালাম। আমারও হঠাৎ খুব ক্লান্ত লাগছিল। বললাম, 'জানি। আপনি গিয়েছিলেন আপনার স্বামীর গোপন প্রেমটাকে এক্সপোজ করে দিতে। আমাদের নিয়োগ করেন যাতে একটা উইটনেস থাকে যে আপনার স্বামী একটা খারাপ মহিলার সঙ্গে মিশছে। সেটা যাতে আপনার বাবা জানতে পারে। তাই তো?'

পামেলার মাথাটা নিচু হয়ে যায়।

জলঢাকা নদী, পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে চলেছে।

পামেলা আমাকে কোনো প্রশ্ন করেনি। আমি নিজেই আগ বাড়িয়ে বলেছিলাম। যে সেদিন রাতে এলিয়ট রোডের গেস্ট হাউসে গিয়ে পামেলা দেখে যে সঞ্জয় সেনের বান্ধবী পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এলিয়ট রোডের গেস্ট হাউস। রাত দশটা। সঞ্জয় সেন একটা চেয়ারে বসে। পেছনে এক মহিলা পিস্তল উঁচিয়ে বলে; 'টাকার ব্যাগটা রেখে চলে যান। আপনার স্বামী আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে।'

পামেলা ব্যাগটা আঁকড়ে বলে, 'না। আপনারা যত টাকা চেয়েছিলেন, ততটাই এনেছি। আমার স্বামীকে না নিয়ে এখান থেকে আমি যাব না।

মহিলা, 'বোকামি করবেন না। যার টাকা নিয়ে আসার কথা ছিল, সেই অজয় রাই আসেনি। আপনি এসেছেন। তাই ভালোয় ভালোয় টাকা রেখে চলে যান।'

পামেলা, 'আপনি না ওর বান্ধবী?'

মহিলা, 'ওখানেই তো ভুল করেছেন। আপনি করেছেন। সঞ্জয় নিজে করেছে...আপনাদের বাবা একটা বোকা লোক!

ঘরে ঢোকে ড্যানি।

মহিলা, 'আপনি কে?'

ড্যানি, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ সিআইডি। চাকরিটা গেছে, কিন্তু পুলিশে যথেষ্ট কানেকশন আছে। সুতরাং এই কিডন্যাপের বোকা খেলাটা বন্ধ হবে।' ড্যানি তার পিস্তল বার করার আগেই মহিলা গুলি করে। ড্যানি টাল খেয়ে দরজার কাছে পড়ে যায়।

মহিলা সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কে লোকটা?' অসহায় সঞ্জয় বলে, 'জানি না।'

পামেলার দিকে তাকিয়ে সঞ্জয়ের দিকে পিস্তল তোলে, 'ভুল করলেন!' তারপর গুলি। সঞ্জয় চেয়ারে গুটিয়ে যায়। মহিলা হতভম্ব পামেলার হাত থেকে টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে, ড্যানির মৃতদেহ ডিঙিয়ে বেরিয়ে যায়।...

জলঢাকা নদী পাথরে ঠোক্কর খাচ্ছে। এবার আমি একটা সিগারেট ধরাই।

'কী, ঠিক বললাম?'

উত্তর নেই। তাই আবার প্রশ্ন।

'আপনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনে ফেলে যাওয়ার গপ্পোটা কেন বললেন?'

পামেলার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল ও আমার কানের দিকে তাকিয়ে বলছে, কারণ আমি ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম না।

'আমি বুঝতে পারছিলাম না কী বলব, কী করব। সঞ্জয় আমায় ঠকিয়ে প্রেম করতে গিয়ে নিজেই ঠকেছে। কিন্তু মারা গেছে। বাবাকে কী বলব? তাই আপনার কাছে যাই। আপনাকে বিশ্বাস করেছি মনে হয়েছিল আপনিই একমাত্র আমার বাবাকে বোঝাতে পারবেন যে আমি কোনো দোষ করিনি।'

পামেলার চোখের জল জলঢাকা নদীর মতো কোথাও *কোনো ঠোক্কর* না খেয়ে যত্ন নিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

'সুব্রতবাবু, আপনি বাবার জন্য কাজ করছেন। আশা করব এই চত্বরের গুন্ডার দল, যারা বাবার মদতেই লুকিয়ে তার ক্ষতি করতে চায়, তাদের ধরবেন, শাস্তি দেবেন। শুধু এটা জানানোর জন্য এসেছিলাম যে আমি আপনার কোনো ক্ষতি চাই না।'

তারপর কাঁধে একটা নরম হাত, আর আবার নেলপালিশের কড়া গন্ধ। পামেলার হাই হিল জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম কেন ড্যানি ব্যানার্জি তার বউকে ঠকিয়ে, এক অন্য মহিলার সঙ্গে প্রেম করে। চাহিদা। শরীরের ভেতরের প্রবল চাহিদা। যে চাহিদাকে আমি খুন করেছি রোজ রাতে ডাক্তার সেনের বাড়িতে, সস্তার রাম খেয়ে।

পকেটের সেল ফোনটা হুড়মুড় করে জেগে উঠেছিল। ওপার থেকে আমার ডাক্তার লেনের বাড়িতে শোনা চেনা কণ্ঠস্বর।

'অজয় রাই বলছি। চলে আসুন। আমার বেআইনি মদের ঠেকে। এখানেই কথা হবে।'

যখন অজয় রাইয়ের নিল প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা মদের ঠেকে পৌঁছলাম তখন সূর্যটা মুখ থুবড়ে পড়েছে পাহাড়ের পেছনে। যতটুকু আলো ছিল তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অজয় রাই একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে। লজ্জা ঢাকার জন্য যাবতীয় যা পরার পরে আছে। অতিরিক্ত শুধু বুক পকেটের ওপর একটা গুলির ক্ষত!

সাত

রুদ্রশেখর চৌধুরি মাথা নিচু করেই বললেন, 'আপনার নাকে কী হল?'

তার বোকা ম্যানেজার তাকে আর এক পেগ হুইস্কি ঢেলে দেয়।

আমি বলি, 'বনমুরগি আঁচড়ে দিয়েছে।'

বাংলোর বাইরে অদূরে একটা ট্রেনের হুইস্‌ল! রাতের ঝিঁঝির শব্দটা বাড়ছে।

এর আগে কী হয়েছিল চট করে বলে দিই। পার্ক স্ট্রিট থানার গাঙ্গুলি আমাকে মালবাজারের আইসি-র নম্বর পাঠান। রমেশ থাপা। ভদ্রলোক দলবল এবং মেটিলি থানার ওসি লাহাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এসে অজয় রাইয়ের লাশ উদ্ধার করে। অফিসার লাহা, ছিপছিপে, পেটানো। বললেন তিনি প্রমোদবাবুকে জানিয়েছিলেন যে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। রমেশ থানার মারফত শিলিগুড়ির ডিএসপি সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল। খারাপ নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও গলার স্বর শুনে বোঝা গেল লোকটা সজ্জন, এবং আমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত। 'আমার নম্বরটা থাপা আপনাকে দিয়ে দেবে।'

অফিসিয়াল রিপোর্ট লেখার জন্য মেটিলি থানায় যেতে হল। অফিসার লাহার গাড়ি করেই গেলাম। উনি বললেন মালবাজারের আইসি যখন ফোন করে আপনার কথা জানান তখন নাকি ওঁর মনে হয়েছিল আমি কলকাতার প্রাইভেট গোয়েন্দা।

'সাংবাদিকরা গোয়েন্দার থেকে কম কিছু নয়।'

ওঁর দমফাটা হাসি। আমি হাসতে গিয়ে নাকের যন্ত্রণার রঙটা বেড়ে গেল। সামলে নিয়ে বললাম; 'কে খুন করেছে বলুন তো?'

'অ্যাঁ?'

'কে করেছে খুনটা মনে হয়?'

'দেখুন আপনি সাংবাদিক, ফস্ করে কী বলে দেব আপনি লিখে নেবেন। তবে একটা বলতে পারি এই অজয় রাই এই চত্বরের এক নম্বর গুন্ডা। খুব ঝামেলা করছিল। রুদ্রবাবুর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে চট করে কিছু করা যাচ্ছিল না। মরেছে ভালোই হয়েছে।'

খুব বেশি প্রশ্ন করতে হয়নি। লাহাবাবু খানিকটা আগ বাড়িয়েই বললেন এই চত্বরে এক সমাজসেবী আছেন। প্রৌঢ়। এক সময় শ্রমিক আন্দোলন করতেন। এখন একটা এনজিও চালান। বিনা পয়সায় গ্রামবাসীদের জন্য একটা ক্লিনিক চালান। অজয় রাই প্রায়ই ওঁর সমাজসেবায় বেগড়া দিত। সমাজসেবী শংকর চ্যাটার্জি প্রায় থানায় এসে রাইয়ের নামে অভিযোগ করেছেন।

'একটু পাগলাটে টাইপের। গতকাল তো আমাকে এসে সোজা বলে গেল যদি আমি কোনো স্টেপ না নিই, তাহলে ও নাকি রাইকে খুন করবে। কথাটা আপনি ওকে বলবেন না তাহলে আমার ওপর এসে ঝাঁপাবে।'

আমি আশ্বাস দিলাম কেউ ওঁর ওপর ঝাঁপাবে না। উনি আশ্বাস চাইলেন যে আমি যদি শিলিগুড়ির ডিএসপি-কে জানাই যে উনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করার চেষ্টা করছেন।

থানা থেকে বেরিয়ে, বোকা ম্যানেজার মনে করিয়ে দিলেন আমার লাঞ্চ খাওয়া হয়নি। আমার পালটা প্রশ্ন।

'ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ভুবন প্রধান তো লাটাগুড়ির বাজারে খুন হয়, সেটা কি বন্ধই থাকবে?'

'সঞ্জয়বাবু ওটা আর চালাতে চাননি।'

'আর এখন পেট্রোল পাম্পগুলোর কী হবে?'

'সেই নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে বসতে হবে। আপনি লাঞ্চটা খাবেন তো?'

'ওই কাঠগোলা? কুমুদ সাহা। ওঁর একটা ধাবাও আছে না?'

'লাটাগুড়ির ফেমাস তড়কা।'

'চলুন ওখানেই খাওয়া যাক।'

কুমুদ সাহার প্যারাডাইস ধাবা পৌঁছতে প্রায় সন্ধে সাতটা বেজে গেল। গোলগাল, মোটাসোটা সাহা খালি গায়, তার থেকেও মোটা একটা লোকের কাছ থেকে ম্যাসাজ নিচ্ছিল। প্যারাডাইস ধাবায় শেষ কবে কেউ খেতে এসেছে, তার রং-চটা গুটিকতক টেবিল আর চেয়ার মনে হল ভুলে গেছে।

'কী খাবেন?'

আমি তার একেবারে সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললাম, 'মদ?'

'খাবারের দোকানে মদ?'

'তাহলে মেয়েছেলে?' একটা সিগারেট ধরালাম।

'এসব কী আলফাল বলছেন?'

'আপনার কাঠগোলার থেকে তো ছ'মাস আগে নেপাল থেকে স্মাগল করা অজস্র জিনিসপত্তর ধরা পড়ে। সঞ্জয়বাবু'র অফিসের ফাইল বলছে আপনার জেল হয়। তাই বলছি আপনার ধাবার আসল ব্যবসাটা কী? মদ না মেয়েছেলে?'

ভদ্রলোক তার বাঁ হাত দিয়ে তার ম্যাসাজওলাকে সরিয়ে দেয়।

'ওসব করছিল কাঠগোলার কর্মচারী নরেন। সে এখন ফেরার। আমার নামে মামলা খারিজ হয়ে গেছে।

'নরেন ফেরার নয়, লাটাগুড়ির বাজারে গুলি খেয়ে মারা যায়। আপনি কী খাবেন সেটা ঠিক করুন। কারণ শিলিগুড়ির ডিএসপি-কে অনেক অজানা তথ্য আমি পাঠিয়ে দেব। সেখান থেকে কলকাতার সিআইডি দপ্তরে।'

ড্যানি-র পিস্তল বাঁ হাতে বার করে, কনুইটা টেবিলে রাখলাম।

'এবার কিন্তু মালবাজার থানা নয়। সোজা সেন্ট্রাল জেল। কলকাতা।'

পাহাড়ে প্রায় ইলেকট্রিসিটির ভোলটেজ হেরফের করে। ধাবার আলোগুলো নিভু নিভু হয়ে আবার জ্বলে গেল। কুমুদ সাহা রেগে উঠবেন কি না বুঝতে পারছেন না। বোকা ম্যানেজার একটা ভারী বস্তার মতো একটা চেয়ারে বসে পড়েছেন।

'শুনুন সাহাবাবু, বিস্তারিতভাবে কথা বলতে চাইলে, কাল আমার হোটেলে চলে আসুন। রকি আইল্যান্ড হোটেল। রুম নাম্বার দশ। কালকের মধ্যেই কিন্তু।'

সন্ধেবেলা কালো চশমা পরার কোনো কারণ নেই। তবুও ড্যানির সানগ্লাসটা পকেট থেকে বার করে পরে ফেললাম।

'চলুন প্রমোদবাবু!'

রুদ্রবাবুর বাংলোতে পৌঁছতে রাত সাড়ে আটটা হয়ে গেল।

ওঁর আদেশে বোকা ম্যানেজার আমাকে এক গেলাস হুইস্কি এগিয়ে দেয়। রুদ্রবাবু মাথা নিচু করে জানান যে উনি আন্দাজ করেছিলেন যে ওঁর

কারবারের কিছু লোক গোলমাল করছে। তাই সব দায়িত্ব সঞ্জয়বাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

দামি সিঙ্গল মল্ট খাওয়ার অভ্যেস নেই তাই প্রথম চুমুকে মনে হল ভালো চা জাতীয় কিছু খেলাম। রুদ্রবাবু চোখ তুললেন। ক্লান্ত, ভেজা চোখ। ওঁর মেয়ে যখন বিয়ে করে লন্ডন থেকে ফেরে, উনি সঞ্জয়বাবুকে একেবারেই চিনতেন না। তারপর পরিচয় হল।

'আমি ওকে ভালোবেসে ফেলি। আমার মেয়ের থেকেও বেশি বিশ্বাস করি। আমার বিষয়, আশয়, কারবার সব ওর হতে তুলে দিই। ও নিজেও একা একা বড় হয়েছে, তাই আমার খুব যত্ন নিত। পুলিশ ওর কিডন্যাপের কেস ক্লোজ করে দেবে। কিন্তু আমাকে জানতেই হবে সুব্রতবাবু। কে বা কারা ওকে খুন করেছে। আপনাকে অনেক হেনস্থা হতে হচ্ছে বুঝেছি, তার জন্য যদি ফিটা দশ হাজার বাড়াতে হয়, আমি প্রস্তুত।'

'আগে খুনিকে ধরি।' বলে আমি উঠে দাঁড়াই।

রুদ্রবাবু চোখ নামালেন না। ক্লান্তির বদলে এখন চোখ দুটো ঠান্ডা।

'আর আশা করব, আমার হয়ে যখন কাজটা করছেন না তখন আমার মেয়ের ভাড়া করা হোটেল পালটে আমার বুক করা হোটেলে চলে যাবেন।'

এই কথাটাই জানাতে যখন পামেলা চৌধুরির বাংলোতে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। ওর বাবার কথাটা জানাতে ও বলেছিল, আপনার নাক থেকে রক্ত পড়ছে। আমি নাকে হাত দিয়ে বলেছিলাম, 'ব্যান্ডেজটা বোধহয় লুজ হয়ে গেছে।' ও ব্যান্ডেজটা ঠিক করে দেয়। আমাদের মুখ দুটো অনেক কাছে আসে। সেই লাল নেলপালিশের কড়া গন্ধ। তার সঙ্গে আর একটা দামি গন্ধ। তলপেটের ভেতরে একটা অনেক দিনকার টান টান ব্যথা। চুমুটা আমিই খেয়েছিলাম।

আট

পামেলা চৌধুরির বিছানায় ঠিক কী ঘটেছিল আমার পুরোপুরি মনে নেই। তবে যা হয়েছিল তাতে দুজনেরই ভেতরের প্রবল চাহিদা, দাবি, কেড়ে নেবার ইচ্ছে ছিল। একটা জ্বলন্ত ইচ্ছে। তারপর অনেক দিনের ধামাচাপা ঘুম। হঠাৎ ধড়মড় করে এলোমেলো বিছানাটার ওপর উঠে পড়েছিলাম। জানলার বাইরের আকাশ তখন হালকা গোলাপি আর আমি আমার সাদা জাঙ্গিয়াটা ছাড়া আর কিছু পরে নেই।

পামেলার নেটের নাইট গাউন তার ছোটখাটো, সুঠাম দেহটা ঢাকতে অক্ষম। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সে একটা লাল রঙের কাপ নিয়ে বলে; 'কফি খাবে?'

আমি ডান হাত বাড়িয়ে, বেড সাইড টেবিল থেকে আমার সস্তার সিগারেট প্যাকেটটা তুলে নিই। বাঁ হাতে চাদরটা টেনে নিয়ে, কোমর অবধি ঢেকে নিয়ে, শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'আমি অন্য কোথাও চলে যেতে চাই। নতুন করে শুরু করতে চাই। তুমি যাবে আমার সঙ্গে সুব্রত?'

সিগারেটটা জ্বালিয়ে, ছাইদানিটা বুকের ওপর রেখে, বলি, 'আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার পামেলা।'

'কিন্তু আমি একজন পাশ করা ব্যারিস্টার। আমরা একটা লিগাল ফার্ম খুলতে পারি।'

'আর আমি তোমার সেক্রেটারি?'

জানলার বাইরের আকাশের রঙটা মুখে নিয়ে পামেলা আমার পাশে এসে আমার বুকের ওপর হাতটা রাখে। 'বুকে হাত দিয়ে বলো তো ওই সস্তার ডিটেকটিভ এজেন্সিতে বসে, পরের নোংরা ঘেঁটে তুমি খুশি?'

হঠাৎ মৃত ড্যানির সামান্য হাঁ করা মুখটা মনে পড়ে গেল। আমি হালকা

হেসে চাদর সরিয়ে উঠে বসি, 'মাত্র দশ হাজার টাকা ঘুষ খাওয়ার জন্য ড্যানি ব্যানার্জির পুলিশের চাকরিটা চলে গিয়েছিল। বউয়ের পয়সায় একটা এজেন্সি খুলল যেটা চলে না। অন্য মহিলার কাছে পড়ে থাকত। যাওবা একটা কেস পেল। পোস্টমর্টেমের লাশ হয়ে গেল। কারণ সে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। আমিও তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি।'

আমি উঠে মাটিতে পড়া আমার প্যান্টটা টেনে পরে ফেললাম।

'তার মানে তুমি নোংরাটা ঘাঁটবে?'

ঠোঁটে সিগারেটটা নিয়ে, আমার কলার ছেঁড়া শার্টটা পরতে পরতে বলি, 'তুমিই তো আমাকে নোংরা পরিবেশে এনেছ পামেলা। তাই ড্যানি যা করত, আমাকে করতেই হবে।'

এবার হালকা রাগ। 'কী করবে তুমি? কী করতে পারো এই জঘন্য পরিবেশে?'

জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে, 'মোজা দুটো পকেটে পুরে ফেলি।

'আর যাই করি ল্যাজ গুটিয়ে পালাব না।'

পামেলা কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমি ভোর চারটে নাগাদ পামেলার বাংলো থেকে বেরিয়ে আসি। ফেলে রেখে এসেছিলাম উনচল্লিশ বছরের জীবনের অব্যক্ত কৃতজ্ঞতা যার ওপর পামেলা চৌধুরি আর একটা বাংলো বানাতে পারে।

নয়

বোকা ম্যানেজার আমাকে বলে, 'এই শংকর চ্যাটার্জি কিন্তু ঝামেলার লোক।'

'আপনি তো যাচ্ছেন না। যাচ্ছি তো আমি। আপনি দূরে গাড়িতে বসে থাকবেন। অসুবিধে আছে?'

'না না অসুবিধের কী আছে। কিন্তু আপনি কিছু খেয়েছেন?'

আমি আবিষ্কার করি চব্বিশ ঘণ্টার ওপর আমি শুধু হোটেলের খারাপ চা আর দামি হুইস্কি ছাড়া আর কিছুই খাইনি।

'শংকরবাবুর ওখানে কিছু খেয়ে নেব।'

কিন্তু শংকরবাবু কিছু খাওয়াননি। সামসিং পাহাড়ের ধারে একটা বস্তির ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকালেন। 'আপনি সাংবাদিক?'

ছোটখাটো চেহারা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। মোটা ফ্রেমের চশমার পেছনে চোখ দুটো উজ্জ্বল। একটু চুপ করে থেকে আমি বলি।

'হ্যাঁ ওই কলকাতার একটা পত্রিকার। এই ডুয়ার্স নিয়ে একটা স্টোরি করতে এসেছি। সেই সূত্রে রুদ্রশেখর চৌধুরির সঙ্গে পরিচয়। ওঁর চা বাগান। এই পরিবেশ। তো অনেকের সঙ্গে কথা হল। বুঝলাম ডুয়ার্স শুধু চা বাগান আর প্রকৃতি নয়। আপনার মতো সমাজসেবীও আছে, তাই...'

শংকরের মাথা নিচু হয়। 'না না ওসব তেমন কিছু নয়। একসময় চা বাগানের শ্রমিক নেতা ছিলাম। সেই শ্রমিকদের দায়িত্ব ছিল আমার প্রধান কর্তব্য। এখন বুড়ো হয়ে গেছি তাই যা পারি...।'

আমরা বস্তির মধ্যে দিয়ে হাঁটছি।

'রুদ্রবাবুকে কী মনে হয় আপনার? ওঁর জামাই সঞ্জয়বাবুকে চিনতেন?'

ভদ্রলোক থমকে থেমে গেলেন। গলার স্বর স্যানিটাইটাজের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল।

'লিখবেন? সত্যি কথা? লিখবেন কীভাবে তার চা বাগানের শ্রমিক

আন্দোলন পিটিয়ে বন্ধ করেছিল আপনার স্টোরির মূল চরিত্র, ওই রুদ্রবাবু? লিখবেন?'

আমি একটা সিগারেট এগিয়ে দিই ওঁর দিকে, 'দেখে তো মনে হয় ভদ্রলোক। গুন্ডা পোষেন বলছেন?'

শংকর বেশ কিছুটা সময় নিয়ে আমার সিগারেট নেয়। আমি ধরিয়ে দি।

'রুদ্রবাবুর বাবার মতো দেবতুল্য মানুষ হয় না। নিজে হাতে করে আমাকে বাগানের কারখানার সব কাজ শিখিয়েছিলেন। তারপর উনি মারা যান। রুদ্রবাবু দায়িত্ব নিলেন।...'

আমরা একটা টিলার কাছে একটা পাথরের উপর গিয়ে বসলাম।

'এই দু'খানা চা বাগান দার্জিলিং-এর যে কোনো চা বাগানকে টেক্কা দিতে পারত। তারপর নব্বই-এর দশকে নতুন করে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন আবার শুরু হল। অনেক বাগান বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের বাগানেও তার প্রভাব পড়ল। তারা স্ট্রাইক করল। আমি ওদের অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম এভাবে কোনো উন্নতি হবে না। কিন্তু রুদ্রবাবুর কী হল। তখনই উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমি কী করে শ্রমিকদের ওই অবস্থায় বলি যে বেশি খাটতে হবে? গরিবের পেটে লাথি মারব?'

আমি একটা সিগারেট ধরাই। ড্যানির কালো চশমাটা পকেটে খচখচ করছে। তাই বার করে পরে ফেলি।

'রুদ্রবাবু বাইরে থেকে গুন্ডা এনে শ্রমিকদের পিটিয়ে মেরে ফ্যাক্টরি চালু করল। অনেকে চাকরি ছেড়ে পালাল। জলপাইগুড়ি থেকে শ্রমিক এনে কাজ শুরু হল। এমনকী আমাকে পিটিয়ে মারার চেষ্টা করেছিল ওই অজয় রাই, আর তার দলবল!'

এক পাল ভেড়া তাদের গলার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পাশ দিয়ে চলে গেল।

'এই মালবাজার, সামসিং....আর আগের মতো নেই সুব্রতবাবু। অনেক নোংরামি চলছে এখানে। অনেক চোরাগোপ্তা কারবার। নারী পাচার, স্মাগলিং...শুধু প্রকৃতি আর জঙ্গল নিয়ে লিখলে হবে?'

আমি সিগারেটটা মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে নিভিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

'রুদ্রবাবু'র জামাই কলকাতায় খুন হয়েছেন জানেন?'

শংকরের গলার স্বর চড়ল। অনেকটা গ্যাস ওভেনের গ্যাস চালু করে সামান্য দেরি করে জ্বলন্ত দেশলাই ঠেকালে যা হয়।

'শুনুন, যদি সাংবাদিক সেজে জামাইবাবুর খুনিকে ধরতে এসে থাকেন তাহলে ধরে ফেলব! আর কলকাতার সস্তার টিকটিকি হয়ে যদি আমাকে অজয় রাইয়ের খুনি হিসেবে সাব্যস্ত করতে চান তার ফল ভালো হবে না। আর আমাকে গুন্ডা পুষতে হয় না। এই গ্রামবাসীই যথেষ্ট!'

আমি যতটা গলা নামানো সম্ভব নামালাম।

'সমাজসেবা করেন আবার হুমকিও দেন?'

'হুমকির ওপরই তো চলছে দুনিয়া।'

আমাদের অফিসের মার্কিন ছবির পোস্টারটা মনে পড়ে গেল।

'তাহলে আপনিও শুনে নিন। সমাজসেবার বাতেলা মেরে যদি কোনো অন্যায় করে থাকেন তাহলে আপনিও পার পাবেন না।'

তারপর এগিয়ে, আবার ফিরে এসে।

'আর আমার গ্রামবাসী বা গুন্ডা কোনোটারই প্রয়োজন নেই।'

এরপর সোজা হাঁটা। দেখলাম অদূরে বোকা ম্যানেজার গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। পেছন থেকে ভেসে এল, 'সুব্রতবাবু। সঙ্গে পিস্তল রাখেন তো?'

আমি ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। গলা তুললাম।

'চালাবার জন্য। ভয় দেখাবার জন্য নয়।'

গাড়িটা সামনে থেকেই আসছিল। তাই ধরে নিয়েছিলাম পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু সেটা যে সামনে থেকে রাস্তা ব্লক করে থেমে যাবে, এবং তার থেকে কিছু লোক হুড়মুড় করে বেরিয়ে আমাকে চ্যাংদোলা করে তাদের গাড়িতে তুলে নেবে, বুঝতে পারিনি। আমি কোনোমতে ঘুরে অদূরে শংকর চ্যাটার্জিকে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু একটা কালো কাপড় মুখের ওপর চলে আসায় দেখতে পাইনি। একটা গোঁত্তা। পর পর তিনটে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

তারপর গাড়ির স্পিড বাড়তে থাকে। চারপাশ থেকে গুটকা আর ঘামের গন্ধ।

দশ

মাথায় বাঁধা কালো কাপড়টা খুলে নেওয়া হয়। ঝাপসা চোখেই বুঝলাম এটা কুমুদ সাহার কাঠগোলা। দম আটকে যাওয়া ব্যাপারটা কমল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তিনটি ব্যক্তি।

বোকা ম্যানেজার মাথায় হাত দিয়ে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে। আমার ঠিক উলটো দিকে, অন্তত দশফিট দূরে দাঁড়িয়ে কুমুদ সাহা। একটা সবুজ রঙের গেঞ্জি পরে। হাতে, আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ড্যানির পিস্তলটা আমার দিকেই তাক করা। আমার ঠিক পেছনে, চার ফিট দূরে মেটিলি থানার দারোগা লাহাবাবু।

কুমুদ সাহা ড্যানির পিস্তলটা আর একটু উঁচিয়ে বেশ জোরেই জানান, 'যা কথা হবার এখানেই হবে। আপনার হোটেলে নয়।'

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে, মাথা নামালাম।

'কী বলবেন, না কি পায়ে একটা গুলি করব? মনে রাখবেন এটা আপনারই পিস্তল!'

আমি বেশ বড় একটা দম নিয়ে শুরু করলাম।

'বেশ। তাহলে শুনুন। রুদ্রবাবুর নানান ব্যবসা, যেগুলো আপনি, ভুবন প্রধান এবং অজয় রাই ওঁর মতো গুন্ডারা চালান। কিন্তু ব্যবসাগুলো ভুয়ো। তার পেছনে চলে নানান চোরাকারবার। সঞ্জয়বাবুর অফিসের ফাইল বলছে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ভুবন প্রধান লাটাগুড়ির বাজারে খুন হয়। আমার ধারণা আপনাদের নিজেদের মধ্যে টাকার লেনদেন নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল। আপনারাই খুন করেন। সাহাবাবু, আপনার এই কাঠগোলা রেইড করে পুলিশ অনেক নেপাল থেকে স্মাগল করা জিনিসপত্র পায়। আপনার জেল হয়। তৎকালীন দারোগা নস্করবাবু খুন হন। ওই লাটাগুড়ি বাজারে। তারপর নতুন দারোগা এই লাহাবাবু এসে ভালো টাকা খেয়ে সব যেরকম ছিল সেরকম

করে দেন। আপনি জেল থেকে বেরিয়ে আবার নিজের ধান্দায় মন দেন। যদি, আপাতত সব ঠিক বলে থাকি তাহলে একটা সিগারেট?'

অফিসার লাহা কিছু না ভেবেই তার পকেটে হাত ঢোকান। গর্জে ওঠে সাহা, 'আপনি ওর সিগারেট দেবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?' তারপর আবার পিস্তল আমার দিকে। 'শুনুন, রুদ্রবাবু কিস্‌সু করতে পারবেন না। আপনার শিলিগুড়ির ডিএসপি এখানে আসার আগে গল্প গাছে উঠে যাবে।'

আমি ঠান্ডা মাথায় সাহাকে বোঝাই যে গল্প অনেকদিন আগেই গাছে উঠে গেছে। সঞ্জয়বাবু ব্যবসার দায়িত্ব নিয়ে পুরো গোলমালটা বুঝতে পারেন। তারপর অজয় রাইকে দলে টেনে নেন। ওঁর স্ত্রী পামেলার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। তাই ওঁর কলকাতার বান্ধবীর সঙ্গে মিলে নিজেই নিজের কিডন্যাপের গল্প খাড়া করেন।

এগারো

এলিয়ট রোডের গেস্ট হাউস। রাত বারোটা।

পামেলা তার ব্যাগ ভর্তি পঞ্চাশ লাখ টাকা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। হুইস্কি ঢালতে ঢালতে সঞ্জয় যেন থেমে যায়।

'তুমি?'

'তুমি মানে? তোমার কিডন্যাপের টাকা অন্য কর্মচারী দিতে আসবে?'

সঞ্জয় হতাশ হয়ে সোফায় বসে পড়ে।

'শোনো পামেলা তুমি বেকার এর মধ্যে ঢুকে পড়লে। টাকা আনার কথা দিল অজয় রাই-এর।'

'মানে? কী বলছ তুমি?'

'আমাকে কেউ কিডন্যাপ করেনি। ...বোসো। ঠান্ডা মাথায় বোসো।'

পামেলা কিছু বলার আগেই অদূরে কোথাও অ্যাম্বুলেন্স ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যায়।

সঞ্জয় পামেলাকে বোঝাতে থাকে। তার গলা ক্রমশ ঠান্ডা বরফের মতো।

'দেখো পামেলা, আমি তোমার ব্যবসার পেছনে কী চলছে তা বহুদিন ধরে জানি। অনেক বেআইনি টাকার লেনদেন হয়। এত দায়িত্ব নিয়েছি, নিজের শেয়ারটা নেব না? তাই আমি জানিয়েছি আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তোমার বাবা আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসে, তাই টাকাটা দেবে। সেই টাকা নিয়ে আমি আবার ফিরে যাব। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আবার আমার অপহরণ হবে। তোমার বাবা টাকা দেবে। তুমি মাঝখান থেকে ঝামেলা পাকালে....টাকাটা আনার কথা ছিল অজয় রাইয়ের....।'

হঠাৎ ঘরের দরজায় ড্যানি।

'আপনি কে?'

ড্যানি পকেটে হাত দেয় পিস্তল বের করার জন্য।

'স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ, সিআইডি। চাকরি চলে গেছে তবুও পুলিশে যথেষ্ট যোগাযোগ। এই কিডন্যাপের খেলা বন্ধ...।'

কথা শেষ হয় না। তার বুকে সঞ্জয়বাবুর পিস্তলের গুলি। টাল খেয়ে পড়ে যাবার আগে ড্যানির পিস্তল চালু হয়। সঞ্জয় সোফায় লুটিয়ে পড়ে।

কাঠগোলা স্তব্ধ।

'কী ঠিক বললাম প্রমোদবাবু?'

বোকা ম্যানেজার থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়।'

'আ...আমি কী জানি?!'

কাঠগোলার ভ্যাপসা গরমে আমার জামা ভিজে গিয়েছিল। তবুও হেসে ফেললাম।

'এসেছিলেন ম্যানেজার হয়ে। তারপর সব দেখেশুনে হয়ে গেলেন পালের গোদা। অজয় রাই আর জামাইবাবু মিলে প্ল্যান করে ক্ষীর খাচ্ছে। আপনারা তক্কে তক্কে ছিলেন কী করে ক্ষমতায় আসবেন। জামাইবাবু কলকাতায় খুন হল। আমি এখানে এলাম। অজয় আমাকে আটকাতে না পেরে ভাবল মরে যাবার আগে জামাইবাবু আমাকে এমন কিছু বলে ফেলেছেন যা দিয়ে আমি তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারি। তাই আমার সঙ্গে গোপনে একটা ডিল করার চেষ্টা করল। আমি ওর বেআইনি মদের ঠেকে পৌঁছে যাবার আগেই, আপনি প্রমোদবাবু ওখানে পৌঁছে তাকে গুলি করেন। আপনি ভেবেছিলেন আমি সস্তার টিকটিকি। সঞ্জয়বাবুর অফিসের ফাইলগুলো না সরিয়ে আমাকে লাঞ্চ খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হলেন। সেই ফাইলের কপি এখন শিলিগুড়ির ডিএসপি-র কাছে চলে গেছে। তিনি দলবল নিয়ে মালবাজারে পৌঁছে যাবেন আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। আমাকে পুঁতে ফেললেও আপনাদের পালানো ছাড়া আর কোনো গতি নেই। ব্যাংকক তো যেতে পারবেন না। আমি ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। একটা সস্তায় পালাবার জায়গা বলব?'

'কত টাকা লাগবে আপনার?' এবার সাহাবাবুর কপালে ঘাম।

'একশো তিরানব্বই কোটি!'

'মানে?' এবার প্রমোদ মিত্র।

'দুশো পাঁচ টাকাও হতে পারে। নির্ভর করছে আপনারা কতক্ষণ এই বোকা খেলাটা খেলবেন। ডিএসপি মালবাজার ঢুকে পড়েছেন।'

'এবার কিন্তু আমি সত্যি চালিয়ে দেব।' সাহার কণ্ঠস্বর অসহায়।

'আমিও দেব।' অন্য আর একজনের কণ্ঠস্বর।

আমার ঘুরে তাকানোর প্রয়োজন হয়নি।

মোটা ফ্রেমের চশমা পরে শংকর কাঠগোলার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে পিস্তল!

'আপনাদের দৌলতে এখানে সহজেই সস্তার পিস্তল পাওয়া যায়।'

সাহা ট্রিগার টিপলেন। দেশলাই জ্বালাবার শব্দ। আমি বলতে বাধ্য হলাম। 'আরে দূর মশাই, গুলিগুলো আমার পকেটে।'

শংকরের পিস্তলের গুলি পিস্তলেই ছিল। সাহাবাবু বুক আঁকড়ে ধরে মাটিতে পড়লেন। লালাবাবুর পিস্তল চলল। প্রমোদ মিত্র মাটিতে। উনি হঠাৎ এক গাল হেসে বললেন, 'যাক, পালের গোদাকে মেরেছি। বুঝতেই পারছেন আমি কোন দলে?'

আমি ওঁর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিলাম।

'এটা কি পাড়ার ফুটবল হচ্ছে না ইলেকশন? যখন তখন দল পালটাবেন?'

শিলিগুড়ির ডিএসপি নস্করবাবু পৌঁছে গেলেন। সঙ্গে মালবাজারের আইসি থাপা। লাশ চালান হল। অফিসার লাহা গ্রেফতার হলেন। রুদ্রবাবুর অনেকগুলো ব্যবসার অফিস থেকে আরও অনেকে গ্রেফতার হল। ডিএসপি সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। বললেন, 'আপনি তো লাইসেন্স ছাড়াই মাত করে দিলেন। যোগাযোগ রাখবেন। আপনার যখন প্রয়োজনে ফোন করবেন!'

মালবাজার থানার বাইরে বেরিয়ে, সন্ধের আলোতে শংকরবাবুকে জড়িয়ে ধরলাম। উনি আবেগে সামান্য কেঁদেই ফেললেন, 'আরে মশাই আপনাকে কাঠগোলায় নিয়ে গেছে সেটা বের করতেই ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। নইলে অনেক আগেই পৌঁছে যেতাম।' তারপর আমার হাতদুটো ধরে, নিচু গলায় বললেন, 'আপনাকে একটা জিনিস দিতে চাই।'

'চলে আসুন। আমি কোন হোটেলে উঠেছি জানেন?'

'সব জানি। রাতে আসছি।'

পামেলার বাংলোতে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেলাম। রাত আটটা। ভেতর থেকে পামেলার চিৎকার। সেটাকে ছাপিয়ে পুরুষ কণ্ঠ, 'কেন তুমি কলকাতায় যাও? ফাইলটা কোথায়? বলবে নাকি হাত ভেঙে দেব?'

বাঁ হাতে পিস্তলটা নিয়ে, পা দিয়ে দরজাটা খুললাম, 'ওকে ছাড়ুন নইলে গুলি চলবে।'

গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা লম্বা লোক। হঠাৎ থতমত। কিন্তু গলা তুললেন, 'স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকে মারবেন?'

'পায়ে একটা গুলি করলে নেতাগিরি বেরিয়ে যাবে। আর রুদ্রবাবুর মেয়েকে রেপ করার চার্জে যদি একবার জেলে ঢুকে যান তো কোনো পার্টি আর আপনাকে ছোঁবে না। ফুটুন, নইলে গুলি চলবে।'

পামেলার হাত ছেড়ে, হলুদ পাঞ্জাবি আমার গা ঘেঁষে বেরিয়ে ঘুরে তাকায়।

'এক মাঘে শীত যায় না, মনে রাখবেন।'

আমি বাধ্য হয়েই বলি, 'ওটা পুরোনো হয়ে গেছে। নতুনটা শুনে যান। বাঘ বেসিক্যালি বেড়াল!!'

বারো

পামেলার আহত হাতে হাত রেখে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে আগামিকাল তার বাবার কেসটার ইতি করে ফিরে যাব। সে যদি কলকাতা অবধি আমার সঙ্গে যেতে চায় তো তৈরি থাকতে। পামেলা আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'আজকের রাতটা থেকে যাও।' লাল নেলপালিশের গন্ধ আমার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় দু'দিন পেটে কিছু পড়েনি তাই পেটের জ্বালা ছাড়া অন্য কোনো জ্বালাকে আর প্রশ্রয় দিইনি। দু'হাতে ওর মুখটা ধরে বলেছিলাম, 'আজ নয়, কাল।'

হোটেলে ফিরে দেখি কিচেন বন্ধ। ওরা আমাকে ডিমের ওমলেট করে দিল আর হাতে গড়া ঠান্ডা রুটি। মুখের ভেতরের গুচ্ছের কাঁচা লংকা আর সরষের তেলের স্বাদটা ভোলার চেষ্টা করছিলাম আমার সস্তার রাম খেয়ে। ভাবার চেষ্টা করছিলাম, ডাক্তার লেনের ছাপোষা সাংবাদিক ড্যানির পিস্তলটা নিয়ে, ঠিক কখন একটা গোয়েন্দা হয়ে গিয়েছিল, ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আর ধামাচাপা দেওয়া নোংরামির মধ্যে। মনে পড়ে গিয়েছিল ড্যানির সঙ্গে আমার স্বপ্নটা যেখানে ড্যানি বলেছিল, 'স্মৃতি রেকর্ড করে রাখতে হয় নইলে স্মৃতির কোনো মূল্য থাকে না।' হঠাৎ খেয়াল হল ড্যানির পিস্তল, কালো চশমাটা ছাড়াও ওর আর একটা জিনিস আমি কলকাতা থেকে ব্যাগে করে নিয়ে ঘুরছি। ওর সেল ফোন। টেনে হিঁচড়ে ওটা বার করে খোঁজার চেষ্টা করলাম এতে কোনো কিছু রেকর্ড করা আছে কি না।

দরজার বাইরে একটা বস্তা পড়ার শব্দ। উঠে দৌড়ে দরজা গিয়ে খুললাম। নির্জন ব্যালকনির একটা মাত্র টিউব লাইটের আলোতে দেখলাম শংকর চ্যাটার্জি পেটে একটা গুলির ক্ষত নিয়ে আমাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে। সম্পূর্ণ নির্জন হোটেলের বাইরে কোথাও একটা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে, চলে গেল।

'শংকরবাবু! শংকরবাবু!!!'

শংকর স্থির হয়ে গেছেন। উনি যে আসবেন বলেছিলেন, ভুলেই গিয়েছিলাম। বুক পকেটের ওপর থেকে ওঁর হাতটা সরিয়ে দিয়ে দেখলাম, পকেটের ভেতরে একটা ছোট্ট চামড়ার মলাট দেওয়া ডায়েরি। কালো আকাশে, অ্যালুমিনিয়ামের চাঁদ একেবারে স্পষ্ট!

তেরো

'সঞ্জয়বাবুর ডায়েরি। যেটা উনি এখানে একজনকেই বিশ্বাস করে, তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। শংকরবাবু সেটা আমাকে দিতে গিয়ে কাল রাতে আমার হোটেলের কাছে খুন হন।'

ডায়েরিটা রুদ্রবাবুর চায়ের টেবিলে ছুড়ে ফেলেছিলাম। রুদ্রবাবু আমার কথার পরোয়া না করে বললেন, 'সঞ্জয়-এর খুনিকে ধরতে পেরেছেন কি না সেটা আগে বলুন।'

আমি ওঁর দিকে তাকাইনি। 'যদি বলি খুনি মারা গেছে?'

'মানে?'

'চোর ধরতে গিয়ে ডাকাত।'

'হেঁয়ালি ছাড়ুন। দু'দিন ধরে আমার পয়সায় ঘুরে বেড়ালেন। নাক কাটলেন। আমার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিছু গুন্ডাদের পাকড়াও করার জন্য আপনাকে নিয়োগ করিনি আমি।'

রুদ্র চৌধুরির বাংলোর বাইরের বাগানটায় আগাছা রাতে বোঝা যায়নি। কিন্তু দিনের বেলায় স্পষ্ট।

সাদা পাঞ্জাবিতে ঢাকা রুদ্রবাবুর বলিষ্ঠ চেহারা আজ ক্লান্ত লাগছে। সাদা বেতের চেয়ার। একটা নিচু টেবিলে সাদা কাপ। শৌখিন কাচের কেটলি থেকে দামি চা পাতার সুগন্ধ।

আমি কোনো তাড়াহুড়ো না করে যতটা গুছিয়ে বলা যায় চেষ্টা করি।

বছর চল্লিশ আগে রুদ্রবাবুর বাবার দু'খানা টি এস্টেটের দৌলতে এই চত্বরে তৈরি হয়েছিল একটা গোটা বসতি। তিনি গত হবার পর রুদ্রবাবু দায়িত্ব নেন। চেষ্টা করেন এই জায়গাটার অর্থনৈতিক উন্নতি করার। কিছু বিল্ডারের সাহায্যে অনেকগুলো রিসর্ট বানাবার সুযোগ করে দেন। যাতে টুরিজম বাড়ে। কিন্তু যেখানেই বিল্ডার সেখানেই মাফিয়া। রুদ্রবাবু সেই

মাফিয়াদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মদত দেন। কিন্তু তার চা বাগানে যখন আন্দোলন শুরু হয়, কারখানা লক আউট হয়, তখন সেই মাফিয়া গুন্ডাদের সাহায্য নিয়ে তিনি শ্রমিকদের পিটিয়ে কারখানা চালু করেন। কিন্তু একবার যখন তিনি তাদের সাহায্য নিয়ে ফেলেছেন তখন তাদের নানা আবদার মেটাতে বাধ্য হন। তাদের নানা খারাপ ব্যবসাকে মদত দিতে হয়। প্রত্যেকটা ভুয়ো কোম্পানি, যার পেছনে চলে নানা চোরাকারবার। রুদ্রবাবু বুঝতে পারছিলেন না কী করে এর থেকে বেরোবেন? তারপর লন্ডন থেকে তার মেয়ে জামাই আসে। তিনি সঞ্জয় সেনকে ভালোবেসে ফেলেন। তাকে তাঁর কারবারের সব দায়িত্ব দিয়ে দেন।

সঞ্জয়বাবু ক্রমশ বুঝতে পারেন কতটা নোংরামিতে জড়িয়ে পড়েছে গোটা চা বাগান। তিনি সব কুকর্মের এভিডেন্স একটা ডায়েরিতে লিখে কলকাতার সিআইডি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কারণ সঞ্জয় সেন ছিলেন অত্যন্ত সৎ মানুষ। কিন্তু স্রেফ একটা ডায়েরির ভিত্তিতে সিআইডি কোনো কেয়ার নেবে না, তাই তিনি কলকাতার এক সাংবাদিক, রিতা গোমস-এর সঙ্গে মিলে এখানকার চোরাকারবারিদের ওপর একটা ফাইল তৈরি করেন। রুদ্রবাবুকে জানাননি।

রুদ্রবাবু আরও ক্লান্ত। 'সে পামেলাকেও জানায়নি।'

'কারণ পামেলা আপনার মেয়ে। রক্তের সম্পর্ক। কিন্তু পামেলা কোনোভাবে জানতে পারে এই রিতা গোমস-এর ব্যাপার এবং ধরে নেয় সে সঞ্জয়বাবুর প্রেমিকা।'

'আমি আন্দাজ করেছিলাম সঞ্জয় আমার পেছনে আমার কারবার নিয়ে তদন্ত করছে। আমি ওকে নানাভাবে ঘুরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে একটা জায়গার অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে ক্ষমতার দরকার...। সেই ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। আপনি বুঝতে পারবেন না সুব্রতবাবু। কারণ আপনি কোনো দায়িত্বই নেননি। আপনার এজেন্সির বসকেই তো বাঁচাতে পারেননি।'

অদূরে পাহাড়ের দিকে চোখ চলে গেল। কুয়াশা নামছে পাহাড়ে। 'না, পারিনি। কিন্তু আপনি যখন নিয়েছেন তখন মনে রাখতে হবে যে অর্থনীতির মধ্যে নীতি বলে একটা বস্তু আছে। সেটা বাদ দিলে থেকে যায় শুধুই অর্থ।'

রুদ্রবাবু তার সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জ্বলন্ত দেশলাইটার

দিকে তাকিয়ে, সিগারেট ধরালেন না। মুখটা কিছুক্ষণের জন্য একটু লালচে হয়ে আবার ক্লান্ত হয়ে গেল। 'আমি সঞ্জয়কে ভালোবেসেছিলাম। নইলে সব জেনেও তার খুনিকে খোঁজার জন্য আপনাকে টাকা দেব কেন?'

আমি উঠে পড়ি।

'আমার ধারণা আপনি চেয়েছিলেন সঞ্জয়বাবু তাঁর নিজের মতো এই জায়গার নোংরামি সাফ করুন।'

নিচু হয়ে টেবিলের ডায়েরি তাঁর দিকে ঠেলে দিই, 'সুতরাং সঞ্জয়বাবু যখন নেই কাজটা আপনাকেই করতে হবে।'

পকেট থেকে কালো চশমা বার করি।

'আমি কোনো অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিইনি রুদ্রবাবু। কোনো সমাজসেবী নই। স্রেফ একটা সস্তার টিকটিকি যার কাজ সত্যিটা খুঁজে বের করা। যে পঁচিশ হাজার টাকার অ্যাডভান্স আপনি দিয়েছেন, তা দিয়ে অফিসের দুজনের দু'মাসের মাইনে আর ইলেকট্রিসিটি বিল মেটানো যাবে। বাকি পঁচিশ হাজারের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ খুনিকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারলাম না।'

চশমাটা পরে ফেলি।

'তবে একটা জায়গার অর্থের দায়িত্ব যখন আপনি নিয়েছে। কিছুটা নৈতিক দায়িত্ব থেকেই যায়।'

আমি ঘুরে বলে এসেছিলাম। ফেলে রেখে এসেছিলাম একটা নীরবতা যার ওপর রুদ্রবাবু চাইলে গোটা চারেক শপিংমল বানাতে পারবেন।

চোদ্দো

পামেলার বাংলোতে ঢুকেই আমি একটা বড় পেগ হুইস্কি ঢালি।

পাশের ঘর থেকে একটা কালো সিল্কের শার্ট আর কালো প্যান্ট পরে ও বেরিয়ে আসে।

'এত দেরি হল? আমি কখন থেকে অপেক্ষা করছি। প্লেনের টিকিট বুক হয়ে গেছে।'

নেলপালিশের রং আজ নীল। আর গন্ধটাও একটা অচেনা ফুলের। আমি এক ঢোকে গোটা পেগ গলায় ঢেলে, আর একটা গেলাসে ঢালি।

'কী হল সুব্রত? আমরা বেরোব না? আমি সত্যি নতুন করে শুরু করতে চাই।'

'সেটা করার জন্য তো টাকা লাগে পামেলা!'

'আমার কাছে সে টাকা আছে।'

'জানি, তোমার বাবার দেওয়া পঞ্চাশ লাখ। যেটা কলকাতায় কিডন্যাপারদের দেবার কথা দিল।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে পামেলা জানায় সে টাকায় তার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি গেলাস হতে নিয়ে যখন বাইরে বেরোলাম, তখন পামেলার ব্যালকনি ছাড়িয়ে মূর্তি নদীর জল হালকা গোলাপি। সূর্য পাহাড়ের পেছনে হেলতে শুরু করেছে।

'তুমি জানতে তোমার ব্যবসার গোলমাল নিয়ে তদন্ত করছে তোমার স্বামী। কিন্তু জানতে না সঞ্জয়বাবু একটা ফাইল তৈরি করছেন। সেই খবরটা জানায় তোমার স্থানীয় এমএলএ। সে গতকাল তুমি ফাইলটা নিয়ে এসেছ কি না জানার জন্য তোমার হাত ভাঙতে চেয়েছিল।'

'সঞ্জয় আমায় ঠকাচ্ছিল।'

'সেটা তোমার ধারণা। রিতা গোমস একজন সাংবাদিক যে সঞ্জয়বাবুকে

ফাইলটা তৈরি করতে সাহায্য করছিল। এবং তুমি কলকাতায় গিয়েছিলে ফাইলটা হাতাতে। আমাদের কাছে আসো, সিকিউরিটির জন্য।'

'সঞ্জয়কে কেউ কিডন্যাপ করেনি?'

দ্বিতীয় পেগটাও আমি এক ঢোকে গিলে ফেলেছিলাম।...

এলিয়ট রোডের অফিস। রাত দশটা।

পামেলা টাকার ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢোকে। সঞ্জয় টেবিলে রাখা ফাইলের ওপর ঝুঁকে কী করছিল। মাথা তোলে। 'তুমি? এখানে কী করছ?'

'শোনো সঞ্জয়। ঠান্ডা হয়ে বসে মন দিয়ে শোনো। আমি বাবাকে বলেছি তুমি কিডন্যাপড হয়েছ। অপহরণকারীরা পঞ্চাশ লাখ টাকা চায়। বাবা তোমাকে এতটাই ভালোবাসে যে টাকাটা দিয়ে দিয়েছে। এই টাকাটা নিয়ে চলো আমরা অন্য কোথাও নতুন করে শুরু করি। এই নোংরামি থেকে অনেক দূরে।'

ইলেকট্রিক শক্ খাবার মতো সঞ্জয় সামান্য ছিটকে গিয়ে বসে পড়ে। 'এসব কী বলছ তুমি?'

পামেলাও বসে। শান্তভাবে সিগারেট ধরায়।

'তোমার এই তদন্ত বন্ধ করো। এই ফাইল ফেলে দাও।'

'কী বলছ তুমি? আমি এত কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এটা বানালাম যাতে সিআইডি একটা স্টেপ নেয়। সুকনা টি এস্টেটকে পরিষ্কার করতেই হবে।'

'চুলোয় যাক সুকনা টি এস্টেট!'

পামেলা সিগারেটটা তার হাই হিলের চাপে থেঁতলে দেয়।

'কোর্টে মামলা হলে, আমাকেও কোর্টে যেতে হবে কারণ আমি চৌধুরিবাবুর মেয়ে।'

'সে তো আমাকেও যেতে হবে। আমি কথা দিচ্ছি তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।'

পামেলা ফাইলটা তুলে নেয়।

'আমি এ ফাইল তোমাকে জমা দিতে দেব না। তুমি সিআইডি-র দালাল। তুমি ওদের সাহায্য করছ। আমাকে ওরা ঝামেলায় ফেলবে। আমার কেরিয়ারের ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'ফাইল ফেরত দাও পামেলা!' সঞ্জয়বাবুর গলা হঠাৎ ঠান্ডা।

'দেব না আমি। এ ফাইল আমি নষ্ট করে দেব।'

সঞ্জয়বাবু পকেটে হাত ঢোকান। বেরিয়ে আসে একটা ছোটো মাউসার রিভলভার। ঘরের টেবিল ল্যাম্পের আলোতে তার চোখদুটোও ঠান্ডা।'

'তুমি আমাকে পিস্তল দেখাচ্ছ?'

পামেলা ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তল কেড়ে নিতে চায়। কয়েক সেকেন্ড ধস্তাধস্তি তারপর একটা শব্দ। সঞ্জয়বাবু সোফায় এলিয়ে পড়ে।...

মূর্তি নদীর জল এখন সোনালি। আকাশ লালচে।

'ওটা, ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট ছিল সুব্রত!'

আমার জিভের তলায় একটা তেতো স্বাদ।

'আর ড্যানি ব্যানার্জি?'

আবার এলিয়ট রোডের অফিস।

হাতে রিভলভার আঁকড়ে পামেলা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢোকে ড্যানি। কণ্ঠস্বর অদ্ভুত রকম মোলায়েম।

'ম্যাডাম, পিস্তলটা দিন।'

'এটা অ্যাকসিডেন্ট! আমি গুলি করতে চাইনি!'

শান্তভাবে ড্যানি হাত বাড়ায়। 'আমি জানি। পিস্তলটা দিয়ে দিন।'

পামেলার চোখ জ্বলছে। মুখ ফ্যাকাসে। 'আমি কোর্টে যাব না।'

'কোর্টে আপনাকে যেতেই হবে। এটা পুলিশ কেস। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি আমি সাক্ষী দেব। আমি বলব যে উনি আগে বন্দুক বার করেন।... পিস্তলটা।'

পামেলা ড্যানির দিকে তাকায়! 'কে আপনার কথা বিশ্বাস করবে? দু-পয়সার গোয়েন্দা? আমি কিছুতেই থানায় যাব না। আমার লাইসেন্স চলে যাবে। কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে।'

'পিস্তলটা!' আর কিছু বলতে পারে না ড্যানি। পামেলা চোখ বন্ধ করে ড্যানির দিকে গুলি করে। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াবার চেষ্টা করে ড্যানি মাটিতে পড়ে যায়...

আকাশের রং এখন কালচে লাল। মূর্তি নদীর জল ঘোলাটে। আমার বুকের ভেতরে কোথাও একটা উষ্ণ ব্যথা।

'তুমি এটা প্রমাণ করতে পারবে সুব্রত?'

'হ্যাঁ। ড্যানি ব্যানার্জি তোমার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তোমাদের

সব কথা তার ফোনে রেকর্ড করেছিল। ফোনটা আমার কাছে।'

পামেলা আমার হাতদুটো জাপটে ধরে। চোখে জল আর অচেনা ফুলের গন্ধ।

'আমি তোমাকে সত্যি ভালোবেসেছি সুব্রত!'

আমি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করিনি। বুকের ব্যথাটা উদাসীনতায় পরিণত হয়েছিল।

'আমিও ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আমার অজান্তেই। আমার বস্, ড্যানি ব্যানার্জিকে।'

পামেলা চোখ মুছে, দূরে সরে গিয়ে, গলা তোলে।

'ওই সস্তার এজেন্সিতে বসে, দু'পয়সার টিকটিকি হয়ে, গোটা জীবনটা কাটাতে পারবে তো?'

আমি উদাসীনভাবে বলি, 'ওই সস্তার অফিসটাই যে আমার জায়গা পামেলা। আর তোমার জায়গা জেল। শিলিগুড়ির ডিএসপি-কে আমি সব জানিয়েছি। উনি আসছেন তোমাকে অ্যারেস্ট করতে। কী করবে তাড়াতাড়ি ঠিক করো।'

তারপর মুখ ঘোরাই, 'ড্যানি ব্যানার্জি যতই মাতাল, লম্পট, সস্তার গোয়েন্দা হোক না কেন, তার লাশের দাম টাকা দিয়ে কেনা যায় না।'

কথাগুলো পামেলা পুরোটা শুনেছিল কি না আমি জানি না। ওর জুতোর শব্দ বলেছিল ও ঘরে ঢুকে যায়। আরও নানান সব শব্দ। আমি জানতাম ওর কাছে সঞ্জয় সেনের পিস্তলটা আছে, তবুও দরজার দিকে পেছন ফিরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।...হঠাৎ একটা গুলি। তারপর একটা ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ।

থানার কাজকর্ম মিটিয়ে ট্রেন ধরতে ধরতে পরের দিন। ম্যাকলয়েড স্ট্রিটের অফিসে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যায়। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ড্যানির ফাঁকা চেয়ারটা দেখে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ফেলি।

সেই কান্না থামানোর একটাই রাস্তা ছিল। দেরাজ থেকে ড্যানির মদের বোতলটা বার করে একটা বড় পেগ ঢেলে, তার চেয়ারে বসে, তারই মতো টেবিলের ওপর দুটো পা তুলে দিয়ে, তারিয়ে তারিয়ে হুইস্কি খাওয়া।

রত্নাকে ফোনটা করেই ফেললাম। 'শোনো রত্না। আমি ফিরে এসেছি।

ওখানে যাওয়ার জন্য কুড়ি হাজার। আর ওখানে পঁচিশ হাজার। তোমার দু'মাসের আগাম মাইনে, ইলেকট্রিকের বিল, আর মালাদিকে কিছু দিয়ে বাকি টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিও।'

রত্না জানায় আমি কত ভালো, আর জানতে চায়; 'শোনো না, তুমি যখন দায়িত্ব নিয়েইছ, তখন মিস্ত্রি ডেকে দরজার নেমপ্লেটটা পালটে দেব?'

'একদম না।'


শিলং
ক্লাবের
একটা
রাত
₹500

ভদ্রলোক নমস্কার করে বললেন, 'আপনিই কি ড্যানি ব্যনার্জি?'

আমি ড্যানির চেয়ার আর ধুলো পড়া টেবিলটা দেখিয়ে বললাম, 'না, উনি আমার পার্টনার। একটা কাজে ব্যস্ত। আপনি যা বলার আমাকেই বলুন।

বেঁটেখাটো, ষাটোর্ধ্ব চেহারা। ক্ষয়ে যাওয়া হাওয়াই শার্টের কলার, তাপ্পি মারা চামড়ার জুতো প্রমাণ করে সময় খুব ভালো নয়। চেয়ারটা টেনে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। বসলেন। বললেন তিনি বর্ধমান থেকে আসছেন। ইনসিওরেন্সে চাকরি করেন। কষ্ট করে তার একমাত্র মেয়েকে কলকাতার নামী কলেজে পড়িয়েছেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন মারফত একটি বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের কলকাতার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করে মেয়ের বিয়ের ঠিক করেন।

'আজকালকার ছেলেমেয়ে। নিজেরা বিয়ের আগে দেখা করবে এ আর এমন কী? ...কিন্তু...'

'কিন্তু?'

ইদানীং তার মেয়ে চন্দ্রিমা প্রায় অনেক রাত করে বাড়ি ফিরছে। বলছে ছেলেটির সঙ্গেই ছিল। ছেলেটি ওকে বাড়ি অবধি গাড়ি করে পৌঁছে দেয়, ভেতরে ঢোকে না।...

'মানে আপনি যদি একটু খোঁজখবর নেন, ছেলেটি কীরকম। একটা বিজ্ঞাপনের কোম্পানিতে ভালো চাকরি করে...কিন্তু ঠিক কীসের চাকরি জানি না।...'

ভদ্রলোকের গলা ধরে যায়। চোখের কোণ ছলকে যায়। আমি টেবিলে রাখা জলের গেলাসটা এগিয়ে দিই। উনি জল খান।

'মধ্যবিত্ত বাঙালি। হবু জামাইয়ের পেছনে গোয়েন্দা লাগাব কোনোদিন ভাবিনি। কিন্তু একমাত্র মেয়ে স্যার। যদি কোনো গোলমাল হয়ে যায়। আমার স্ত্রী গত হয়েছে অনেক দিন। একা আমি...।'

ভদ্রলোক চোখের জল মুছলেন। 'আপনাদের ইয়েটা কত?'

রত্না, আমার সেক্রেটারিকে কিছু বলার সুযোগ আমি দিইনি।

'হাজারখানেক পারবেন?'

ভদ্রলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

'আমি সত্যিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

আমি আবার রত্নাকে কিছু বলার সুযোগ দিলাম না, 'আপনি আপনার হবু জামাইয়ের একটা ছবি, তার ঠিকানা, ফোন নম্বর আর আপনার মেয়ের একটা ছবি দিয়ে যান। আপনার নম্বর। এক্ষুনি কিছু দিতে হবে না। আগে দেখি কী জানা যায়। আর প্রার্থনা করুন খারাপ কিছু না বেরোয়।'

ভদ্রলোক পারলে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। যাবতীয় যা দেবার, গোমড়ামুখো রত্নাকে দিয়ে চলে যান তারাপদ ঘোষ। আমাদের ১১/১ ম্যাকলয়েড স্ট্রিটের বাইরের রাস্তা তখন জমজমাট।

আমার নাম সুব্রত শর্মা। কোনোদিন গোয়েন্দা হবার ইচ্ছে কেন, স্বপ্নও দেখিনি। হঠাৎ করে উনচল্লিশ বছর বয়েসে এসে ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি'র দায়িত্বটা কেন নিই সেটার মানে বুঝতে গেলে বাড়িতে একটা ছাদ আর তাতে একটা ট্যাঙ্ক থাকতে হবে। রাত হতে হবে। ট্যাঙ্কের মাথায় বসতে হবে। এবং সেটা পূর্ণিমার রাত হতে হবে।

এত কিছু করার দরকার নেই। ছোট করে বলি। আমার বস ড্যানি ব্যানার্জি একটা কেস সামাল দিতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা যায়। তার বউয়ের গয়না বেচে তৈরি, এই সস্তার এজেন্সির দায়িত্বটা আমি নিই। সন্ধেবেলা রত্না চলে গেলে, ড্যানি ব্যানার্জি, অর্থাৎ আমার মৃত বসের চেয়ারটাতে বসে, তার বিশাল সেক্রেটেরিয়েট টেবিলটাতে দুটো পা তুলে দিয়ে, বসের ফেলে যাওয়া গেলাসেই আমার সস্তার রাম ঢেলে খাই। অনেকটা সময় কেটে যায়। ড্যানির কিছু কথা মনে পড়ে।

'বুঝলে সুব্রত, কেন আমাদের কাছে লোক আসে বলো তো?' এগিয়ে এসে আমার সামনে হুইস্কির বোতলটা রেখে, নিজের গেলাসে চুমুক দেয় ড্যানি ব্যানার্জি।

'জীবনের অনেক ছোটখাটো নোংরামি আছে, যেটা পুলিশ ঘাঁটতে চাইবে না। এখন তুমি বলবে; আমি অন্য লোকের নোংরা ঘাঁটব কেন স্যার। তুমি ঘাঁটবে কারণ তুমি আর চার-পাঁচটা সাধারণ বাঙালির মতো চোখে ঠুলি পরে

বাঁচতে চাও না। তাই নোংরার মধ্যে নেমে, তার ভেতরে হাতটা ঢুকিয়ে...সত্যিটা খুঁজে বার করবে। এটা একটা নেশার মতো। সত্যি খোঁজার নেশা। নেশাটাই তোমার পেশা। কী হল? হুইস্কিটা খাও।'

তারাপদবাবু'র হবু জামাইয়ের নাম হিরণ সান্যাল। ছবিতে অত্যন্ত সুপুরুষ। বেশ ফর্সা। আমারই বয়সি। তার বিজ্ঞাপনের এজেন্সির নাম লোটাস অ্যাডভারটাইজিং। কেয়াতলা রোডে তার ছোটখাটো অথচ বেশ ঝাঁ চকচকে অফিসে ঢুকে মনে হল ভালোই চলছে। কোনো জানলা নেই বললেই চলে। কড়া সাদা নিয়ন আলোর মধ্যে বেশ কয়েকজন রঙিন পোশাক পরা ছেলেমেয়ে তাদের কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে, তাদের সেল ফোন নিয়ে ব্যস্ত।

হিরণ সান্যাল, মার্কেটিং ম্যানেজার। তার লাল রঙের কাপ থেকে কালো কফি খেয়ে, তার সাদা রেকসিনে মোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

'আপনার প্রোডাক্টটা কী?'

'একটা ছোটখাটো ডিটেকটিভ এজেন্সি। আমাদের নামের একটা লোগো করতে হবে। আপনারা লোগো ডিজাইন করেন তো?'

হিরণবাবু উঠে বসলেন। উত্তেজনাটা চোয়ালে।

'ডিটেকটিভ এজেন্সি? মানে সত্যিকারের? কলকাতায়?'

'আমাদের নামটা না শোনার কথা। কিন্তু 'গ্লোব' আছে। স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটি আছে। আপনি কলকাতায় থাকেন তো?'

'আরে মশাই ওসব নাম আমি শুনেছি, কিন্তু মানে...'

'মানে কী?'

'মানে আপনি গোয়েন্দা?'

আমি সংক্ষেপে জানালাম যে আমি এই লাইনে খুব বেশিদিন নই। কিন্তু আমার বস অনেক দিনের। তার নামেই অফিসের নাম। ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি এবং তার একটা পিস্তলের লাইসেন্সও আছে।

'আপনারা এমনিতে কত নেন, এই লোগো করার জন্য?'

ভদ্রলোক আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন কি না জানি না, তবে শেষ প্রশ্নটা উড়িয়ে দিলেন।

'আরে রাখুন মশাই খরচা। আমি গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত। একজন সত্যিকারের গোয়েন্দাকে স্বচক্ষে দেখছি এটা কম কথা, এমনিতে আমরা

ভালোই নিয়ে থাকি তবে এ ক্ষেত্রে সেটা দেখা যাবে। মাল খান তো?'

আমি বললাম বাংলা গল্পের গোয়েন্দাদের সঙ্গে অনেক তফাতের মধ্যে ওটা একটা বড় তফাত, কিন্তু ভরদুপুরে...

'আরে রাখুন তো ভরদুপুর। আপনাদের সম্পর্কে না জানলে লোগোটা কি আকাশ থেকে পড়বে?'

তারপর গলা খাটো করে, 'আরে এটা আমাদের বিজ্ঞাপনী ভাষায় বলে রিসার্চ।'

'চলুন', বলে আমাকে প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে অফিস থেকে বার করে, ওঁর গাঢ় নীল রঙয়ের টয়োটা গাড়িতে তুলে, গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। কেয়াতলা থেকে পার্ক স্ট্রিট, প্রায় কুড়ি মিনিটে। ওঁর বিজ্ঞাপনী রিসার্চের দৌলতে আমার তদন্তের এত সুবিধে হবে কল্পনাও করিনি।

মক্কেলের এক পয়সা খরচা হয়নি। কারণ মদের বিল হিরণবাবুই মিটিয়েছিলেন।

পার্ক হোটেলের ধবধবে সাদা, খোলা রেস্তোরাঁয় বসে একটা দামি সিগারেট ধরালেন আমার মক্কেলের হবু জামাই।

'একটু গরম হবে, তবে এখানে সিগারেট খাওয়া যায়। কী নেবেন বলুন!'

দু'চারটে দামি হুইস্কি পেটে পড়ার পর বেশ করুণ হয়ে পড়লেন হবু জামাই।

'আসলে আমি একটা মুশকিলে পড়েছি সুব্রতবাবু! আমাকে একটু সাহায্য করে দেবেন? যা খরচ লাগে আমি দেব। ধরুন কুড়ি হাজার? যাতায়াত থাকা খাওয়া আলাদা।'

একটা কেস করতে গিয়ে আর একটা। তারাপদবাবুর জন্য দয়া দেখাতে গিয়ে মনের ভেতরে কোথাও যদি কোনো অসোয়াস্তি হয়ে থাকে, তাহলে সেটা উবে গেল। মনে মনে তারাপদবাবুকে একটা ছোট্ট প্রণাম করলাম।

দুই

আরও কয়েক গেলাস দামি মদ, চিনেবাদাম, আর হিরণবাবুর দামি সিগারেট খেয়ে যেটা দাঁড়াল তা হচ্ছে হিরণবাবু উচ্চবংশের ছেলে। দার্জিলিং-এ পড়াশোনা করেছেন। বাপ-মা নেই, একাই থাকেন। কেয়াতলাতেই বড় ফ্ল্যাট। লোটাস অ্যাডভারটাইজিং খুব ভালোই চলছে। একা থাকতে চাইছেন না বলেই বিজ্ঞাপনের মারফত তারাপদবাবুর মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছেন। কিন্তু?...

এই কিন্তুর জন্যই আমি।

বিজ্ঞাপনের দৌলতে নানা ধরনের মানুষের জন্য কাজ করতে হয়। এই নানা ধরনের মধ্যে এক ব্যক্তি রতন হাজারিকা। বিল্ডার। তার একটা বড় আবাসনের জন্য অনেক টাকার বিজ্ঞাপন করেন হিরণবাবু। বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে অনেক দিন। মক্কেল রতনবাবুর কাছে বাকি টাকা চাইতে গিয়ে গোলমাল। টাকা তো দেননি। উলটে হিরণবাবুর পেছনে এক গুন্ডা লাগিয়ে দিয়েছেন। নানাভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে সেই গুন্ডা লুইস। এমনকী, হিরণবাবু'র বাড়ি এসে, পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দিয়ে গেছে লুইস।

'অনেক টাকা পাই জানেন। প্রায় দশ লাখ! পুরো ক্যামপেন ছিল বারো লাখের। কলকাতায় নিশ্চয়ই হোর্ডিং দেখেছেন? গ্রিন হেভেন?'

আমি খেয়াল করেছি কি না জানার আগেই হিরণবাবু আবার তার দুঃখের কাহিনি নতুনভাবে শুরু করলেন।

'বিয়ে করতে চলেছি। বর্ধমানের সাধারণ ঘরের, কিন্তু বড্ড ভালো মেয়ে চন্দ্রিমা। তার কোনো ক্ষতি হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। আমি দশ লাখ না হয় ভুলেই যাব, কিন্তু ওই লুইস যদি আবার বিয়ে করার পর বাড়িতে আসে? বুঝতে পারছেন কী কেলেংকারি হবে?'

আরও একটা বিলিতি সিগারেট জ্বলে উঠল হিরণবাবুর ঠোঁটে। রেস্তোরাঁর স্পিকারে বেজে উঠল একটা ইংরেজি গান।

'আপনাদের কাউকে, মানে খুব প্রয়োজনে, ভয় দেখাবার ক্ষমতা আছে? মানে আইনতভাবে? কারুর কোনো ক্ষতি না করে? স্রেফ ভয়?'

মোদ্দা কথা যেটা দাঁড়াল সেটা হচ্ছে, এই রতন হাজারিকাকে সাবধান করে দেওয়া যে উনি যেন আর হিরণবাবুকে বিরক্ত না করেন।

'পুলিশে খবর দেননি?'

'দেবার আগেই তো হুমকি! আর সত্যি বলতে কী এসব বিল্ডারদের অনেক যোগাযোগ!...যতদিন না বিয়ে করছি একরকম সহ্য করছি। কিন্তু বেচারি চন্দ্রিমাকে আমি এসব জানাতে চাই না। তাই আপনি যদি একটু শিলং-এ গিয়ে ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলেন আমাকে আর হেনস্থা না করতে।'

'শিলং?'

রতন হাজারিকার একটা পৈতৃক বাড়ি আছে শিলং-এ। 'বুঝিয়ে বলা' মানে কড়াভাবে সাবধান করে দেওয়া। অ্যাডভান্স দশ হাজার। যাতায়াতের জন্য বা অন্য খরচা আলাদা। তাহলেই তারপদবাবুর হবু জামাই বিয়ে করার ভরসা পাবে।

আমি আগ বাড়িয়ে আরও একটা হুইস্কির অর্ডার দিই।

'কিন্তু আপনি টাকা না চাইলে তো হুমকির প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, নয় কি?'

'শুধু টাকার ব্যপার নয়। বিয়ে করার আগে একটা চিরকালের জন্য হেস্তনেস্ত করার দরকার নয় কি?'

এই অদ্ভুত মক্কেল, এবং তার অদ্ভুত আর্জি নেব কি নেব না সেটা ভাবতে ভাবতে, আমার ডাক্তার লেনের বাড়িতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল।

বাপ-মা হারানো এই সুব্রত শর্মার জ্যাঠামশাই তাকে তার বাড়ির চারতলার ফ্ল্যাটটা দিয়ে গিয়েছিলেন।

বাকি বাড়িটা কব্জা করে নিয়েছিল তারই ভাড়াটেরা। আমার জ্যাঠা উকিল ছিলেন। ভাড়াটেদের বিরুদ্ধে মামলা করে গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। উৎখাত করতে পারেননি।

আমার ঘরের দেওয়ালে জ্যাঠার উই ধরা, সাদা কালো ছবিটার দিকে তাকালে একটাই কথা মনে পড়ে। জ্যাঠা মরার আগে বলেছিল, 'বাবা সুব্রত

তোকে ল পড়ালাম তার কারণ একটাই। বিলেতে গিয়ে, বড় ব্যারিস্টার হয়ে বংশের নাম উজ্জ্বল করিস।'

আমার কাজের লোক মালতী মাসি আমার রাতের খাবারটা টেবিলে রেখে রোজকার মতো আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'বেশি মদ খাওয়া ভালো নয়।' বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাড়াটাদের কাওতালি শুনতে শুনতে বলি, 'তুমি শুয়ে পড়ো। কাল দু'দিনের জন্য একটু বাইরে যেতে হবে।'

বংশের নাম উজ্জ্বল করেছি কি না আমি জানি না। ফোন করে তারাপদবাবুকে জানাই যে তার হবু জামাই ভদ্রলোক, যে বিয়ের আগেই বিবাহিত জীবনের সুরক্ষা নিয়ে ভাবে। দু'দিন পরে অফিসে এলে বিস্তারিতভাবে সব জানাব।

দু'দিন পরে তাঁকে অফিসে আসতে হয়নি। কারণ আমিই শিলং-এ আটকে পড়েছিলাম।

শিলং-এর ক্লাইভ কলোনির, ক্যাসেল রোডে, পাহাড়ের ধারে, একটা বড় বাংলো বাড়ির বারান্দায় রতনবাবুর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায়। আমিই আবিষ্কার করি।

ঘরের দরজা খোলা ছিল, তাই ফ্লাইট ধরে গুয়াহাটি হয়ে, তারপর গাড়ি করে যখন সেখানে পৌঁছেছিলাম তখন রাত আটটা। অন্ধকার বসার ঘরে ঢুকে, একটু এগোতে একটা উলটে থাকা সোফায় ঠোক্কর লেগে মুখ থুবড়ে পড়ি অ্যাশট্রের ওপর। তারপর কোনোমতে ছাই আর পোড়া সিগারেট ঝেড়ে, ফোনের আলো জ্বালিয়ে অদূরে বারান্দায় মৃতদেহটা দেখতে পাই।

তারপর মাথার পেছনে একটা প্রচণ্ড গরম আঘাত। সব লাল হয়ে যায়।

তিন

ডিসেম্বর মাস। শিলং থানার জানলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডার চোটে মাথার তালুতে ব্যথা বাড়ছে। ঘরের নিয়ন আলো ঘিরে নানান পোকা। থানার আইসি, সুরেন বোরা, খাসি প্রজাতির হলেও ভালো বাংলা বলেন।

'আপনি ডিটেকটিভ?'

আমি যতটা সম্ভব গুছিয়ে বলি। উনি বোঝেন। পুরোটা না হলেও, অনেকটাই। কিন্তু আমার পকেটের রিভলবারের লাইসেন্সটা যে আমার নামে নয়, আমার বসের, এখানটাই আটকে যান এবং এখানেই শিলিগুড়ির ডিএসপি নস্করবাবুকে ফোন করাটা কাজে দেয়।

কয়েক মাস আগে, ডুয়ার্স অঞ্চলে আমার প্রথম কেস করতে গিয়ে নস্করবাবুর সঙ্গে আলাপ। ডুয়ার্সের একটা বড় চোরাকারবার, এবং বেশ কিছু গুন্ডাদের ধরতে পারার জন্য নস্করবাবু আমার কাছে কৃতজ্ঞ। এবং ভাগ্যক্রমে আইসি বোরার সঙ্গে পরিচিত।

থানার বাইরে রাত তখন বারোটা। বোরা আমার দিকে একটু ঝুঁকেই বলেন, 'দেখুন সুব্রতবাবু। আপনি এসেছিলেন আপনার ক্লায়েন্টের হয়ে একজনকে সাবধান করে দিতে। আপনাদের মধ্যে যে ঝগড়া ঝামেলা হয়নি, এবং তার দেহের গুলি যে আপনার রিভলভারের নয় সেটা প্রমাণ করবে পোস্টমর্টেম। যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে, আইনতভাবে আপনি সাসপেক্ট। কিন্তু পুলিশ আপনিই ডাকেন। নস্কর আমার অনেক দিনের বন্ধু। তাই কোনো একটা হোটেলে উঠে পড়ুন। শহর থেকে এক পা বাইরে বেরোতে পারবেন না। কোন হোটেলে উঠেছেন সেটা আমাকে জানাবেন। এই নিন আমার নম্বর।'

মক্কেল হিরণবাবুকে আর কেউ হুমকি দেবে না এবং তার বিবাহিত জীবন নির্বিবাদে কাটবে। কিন্তু যেহেতু কাজটা আমাকে করতে হয়নি তাই তার

খরচটা বেশি না বাড়িয়ে পুলিশ বাজারের কাছে একটা সস্তার হোটেলে ঢুকে গেলাম।

গোলাপি রঙের দেওয়াল আর বেগুনি রঙের আলো। হোটেলের রুম বয়, একটি বেশ রোগা খাসি ছেলে আমাকে বলল, 'ইঁহা সব মিলেগা।' আমার কিছুর প্রয়োজন নেই বলে ওকে বিদায় জানিয়ে, ঘরে কড়া রুম স্প্রে-র গন্ধটা ভোলার জন্য জানলাটা খুলে দিলাম। আমার ব্যাগ থেকে সস্তার রামের বোতলটা বার করে মাথার ব্যথাটা ভোলার চেষ্টা করি।

ব্যথা কমবে না তাই সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়ি। পুলিশ বাজার থেকে একটা অটো জোগাড় করে দেয় আমার হোটেলের রুম বয়। অটো করে সোজা ক্যাসেল রোড। অটো ড্রাইভার রাসেলকে একশো টাকা ওয়েটিং দিয়ে, হাজারিকাবাবুর গেট টপকে অন্ধকার বাংলোতে ঢুকে পড়ি। পুলিশ সিল করে গেছে দরজা, তাই জানলার কাচ ভাঙতে হয়। তারপর হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলি।

বসার ঘর ঠিক যেমন দেখেছিলাম সেরকমই। শুধু ব্যালকনির মৃতদেহ এখন মর্গে। পাশে অফিস ঘর। আমার সেল ফোনের আলোতে, টেবিলের দেরাজ খুলতে হয়। আলমারি, বুক সেলফ্, ঘেঁটেঘুঁটে তেমন কিছুই মেলে না। আবার টেবিলের ড্রয়ারের ভেতর মন দিই। এবার টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে। ল্যাম্পটা জ্বালতে গিয়ে যেটা প্রথম চোখে পড়ে সেটা হল ল্যাম্পশেডের ভেতরে সেলোটেপ দিয়ে আটকানো একটা খাম। খামটা টেনে বার করি।

আমার উনচল্লিশ বছরের জীবনে আমি অনেক নোংরা ছবি দেখেছি। কড়া যৌনতার। পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাত থেকে কেনা বিদেশি যৌন ম্যাগাজিনে। সব পুরুষের জীবনে একটা সময় আসে সেইসব ছবি নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দেখে একটা তাৎক্ষণিক আনন্দ পাওয়া। আমারও হয়েছে। কিন্তু শিলং-এর হাজারিকার বাড়ির অফিস ঘরের টেবিলে পড়ে থাকা, টেবিল ল্যাম্পের হলুদ আলোতে ছ'খানা রঙিন ফোটো দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল। একজন সুঠাম নগ্ন পুরুষ। আর একজন অল্পবয়সি নগ্ন বাঙালি মেয়ে। বাঙালি কারণ তার মুখের সঙ্গে তারাপদবাবুর দেওয়া তাঁর একমাত্র মেয়ে চন্দ্রিমার হুবহু মিল।...

তখন বর্ষাকালে খুব বেশি জোরে বৃষ্টি পড়লে আমাদের ম্যাক্লয়েড

স্ট্রিটের অফিসে ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ত। ঘরে দু'চারটে বালতি, গামলা রাখতে হত। ড্যানি অফিসে ঢুকে, তার রেনকোট না খুলেই, দুটো বালতি ডিঙিয়ে আমার টেবিলের ওপর একটা খাম ছুড়ে ফেলে।

'দেখতে হলে দেখো, নইলে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে দাও। মক্কেলের বউ আর তার প্রেমিকের নোংরা ছবি।'

আমি ছবিগুলো দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, জানলার বাইরে থেকে হোটেলের ঘরের ভেতরের মাটিতে যৌন দৃশ্যের এত ভালো ছবি কী করে তুলল আমার বস। এত স্পষ্ট। ড্যানি ভেজা রেনকোট পরেই দেরাজ থেকে তার হুইস্কির বোতল বের করে গেলাসে ঢালে, 'মক্কেল এসে পড়বে। কিছুতেই ছবি বের করবে না। আমি বলব তোলা হয়নি।'

বাইরে দূরে কোথাও বড় বাজ পড়ল। বৃষ্টির তেজ বাড়ল।

'মানে?'

ড্যানি ভেজা রেনকোট পরেই তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। এক ঢোকে গেলাস সাবাড়। আরও কিছুটা ঢালল।

'সুব্রত, একজন গোয়েন্দার কাজ শুধুই মক্কেলের জন্য কাজ করা নয়। কাজের পেছনের সত্যিটাও খুঁজে বার করা। অর্থাৎ...'

আবার বালতি টপকে ড্যানি আমার টেবিলের সামনে।

'মক্কেল কি শুধুমাত্র তার ডিভোর্সের মামলার এভিডেন্স-এর জন্য আমাকে তার বউয়ের নোংরা ছবি তোলাল? নাকি এই ছবিগুলো দিয়ে সে তার বউকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়? মক্কেল ব্যাংকের কেরানি। বউ বড় পত্রিকার সম্পাদক! কী বুঝলে?'

শিলং-এর ক্যাসেল রোডের রতন হাজারিকার বাড়ির অফিস ঘরে বসে ওই 'ব্ল্যাকমেল' শব্দটা আমার মাথায় ভেসে এল একরাশ ঠান্ডা হাওয়ার মতো। তাহলে কি এই রতন হাজারিকা আমার মক্কেলের হবু বউয়ের নোংরা ছবি দেখিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করছিল? সেই কারণেই রতনবাবুকে ভড়কে দেবার জন্য আমাকে এখানে পাঠাল হিরণবাবু? হবু বউয়ের সঙ্গে এতটাই প্রেম হিরণবাবুর? সত্যি কথাটা লজ্জায় বলতে পারেনি? রতনবাবু বাড়ি না বানিয়ে শুধু ব্ল্যাকমেল করেই রোজগার করেন? অন্য কাউকেও ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল বলে, সে হাজারিকাকে গুলি করল? কিন্তু আমার মাথায় কে মারল?

অনেকগুলো 'কেন' নিয়ে হাজারিকার বাড়ির গেট টপকে যখন বেরিয়ে

এলাম, তখন ঠান্ডা বেড়েছে, কুয়াশা বেড়েছে আর অটো উধাও। দু-পা হেঁটেই বুঝতে পারলাম কেউ আমার পিছু নিয়েছে।

বেশ কয়েকটা কেসের জন্য আমাকে অনেকবার কারুর পিছু নিতে হয়েছে। আমি যার পিছু নিয়েছি সে আমার কাছে একটা 'পেছন দিক', আর আমি তার কাছে একটা 'ছায়া'। বেশ কয়েকবার এই 'ছায়া' হবার দৌলতেই, কুয়াশা ভেদ করে, রাস্তার হ্যালোজেনের আলোতে আমার পেছনের ছায়াটা দেখতে পেলাম।

সামনে অনেকটা অন্ধকার। আমি হাঁটার গতি বাড়িয়ে, ডান দিকের একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে গেলাম। ছায়া এগিয়ে এসে গলি পেরোতেই আমি তাকে পেছন থেকে আঘাত করি। ঘাড়ে।

মনে হল একটা থান ইটের বস্তায় ঘুসি মারলাম। আমার ডান হাতের ব্যথা বোঝার আগেই আমার চোয়ালে একটা বিদ্যুৎ। সস্তা তামাকের গন্ধ। আবার সব লাল হয়ে যায়।

চার

লাল রঙটা ফিকে হতে সময় নিয়েছিল। চোখ খুলে বুঝলাম আমি ক্যাসেল রোডের গলিতে শুয়ে। চোয়াল বেশি নাড়ানো যাবে না আর পকেটের ছবির খাম গায়েব।

পুলিশ বাজারে, আমার সস্তার হোটেলের গোলাপি ঘরে পৌঁছতে কতক্ষণ লেগেছিল জানি না। ঘরে ঢুকে, আমার সস্তার রামের বোতল থেকে বেশ খানিকটা গলায় ঢেলে দেখলাম বাইরে আকাশের রঙটাও গোলাপি হতে চলেছে।

আমার জ্যাঠার রেখে যাওয়া পুরোনো খয়েরি চামড়ার জ্যাকেটটা শীতের জায়গায় গেলে পরি। সেই জ্যাকেটের পকেটেই নোংরা ছবির খামটা ছিল। পাঁচটা ছবি। সেটা ইটের বস্তা নিয়ে গেছে। ছ'নম্বর ছবিটা আমার গেঞ্জির ভেতরে ঢুকিয়ে ছিলাম। ওটা টেনে বার করে, ঘরের বেগুনি আলোতে চন্দ্রিমার মুখটা দেখে, তারাপদবাবুর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল।

একটা চেয়ার জানলার কাছে টেনে নিয়ে বসে ঘুমোবার চেষ্টা করি। ঘুম আসেনি।

মনে পড়েছিল ল'কলেজে পড়ার সময় একটা মেয়ে আমাকে ভালোবেসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তাকে নিয়ে ভাবার আমার সময় ছিল না। কারণ আমি তখন কাঠমান্ডু যাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলাম।

ছোটবেলা থেকেই ঘরের থেকে বাইরেটা প্রিয় ছিল। যাকে বলে ভ্রমণপ্রিয়। এই শিলং শহরে আগে এসেছি। এখানকার বাঁশের কাজ, কচি বাঁশের রান্না, শুয়োরের মাংস এবং একটা অনেক দিনের ঔপনিবেশিক স্থাপত্য মিলেমিশে জমাট বেঁধে আছে এই ছোট্ট, মিষ্টি, ঘিঞ্জি, পাহাড়ি শহরে। সেই শহরে ভোর কীভাবে আসে তা প্রথম দেখলাম।

থানার আইসি সুরেন বোরা আমাকে ডেকে পাঠালেন থানায় সকাল

দশটায়। তাঁর ঘরের নিয়ন আলো ঘিরে পোকা তখনও নাচছে। বেশ খুশি হয়েই জানালেন যে রতন হাজারিকা অনেক দিনের বিল্ডার, কিন্তু ব্যবসায় অনেক সূত্র তৈরি করেছিলেন যাদের মধ্যে একজনের নাম লুইস বড়ুয়া। নানা সূত্রে জানা গেছে এই লুইসের সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছিল না। লুইস একজন গুন্ডা। খুনের রাতে লুইস তার বাড়ি যায়। সাক্ষী একজন ট্যাক্সিচালক। সুতরাং পুলিশের ধারণা লুইসই খুন করেছে। এখন লুইসকে পাকড়াও করা পুলিশের কাজ। আমি কলকাতায় ফিরে যেতে পারি। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো এবং সাহায্য করার জন্য স্থানীয় এমএলএ প্রমোদ দেববর্মন আমার কাছে কৃতজ্ঞ। কলকাতায় ফেরার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রমোদ দেববর্মন গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে ডেকে আনেন তাঁর বিশাল বাংলোতে। শহরের একটু বাইরে।

গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরা এমএলএ প্রমোদ দেববর্মনের বয়স ষাট হবে। তাঁর বলিষ্ঠ চেহারা দেখে মনে হল কোথায় যেন দেখেছি। লম্বা গেলাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে তিনি জানান, যে এক সময় দু'চারটে অসমিয়া ছবিতে পার্ট করেছেন। আমি কোনো অসমিয়া ছবি দেখিনি।

'প্রমথেশ বড়ুয়া কিন্তু অসমিয়া ছিলেন! বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অনেক দিনের।'

আমি খালি পেটে বিয়ার খেয়ে বললাম যে সেটা আমি জানি। দেববর্মন মুচকি হেসে জানান যে বাঙালি হয়ে অসমের পুলিশকে সাহায্য করে আমি সেই পুরোনো যোগাযোগটা আবার প্রমাণ করেছি। শিলং একটা সত্যিই সুন্দর জায়গা এবং আমার আরও দু-চার দিন এখানে থেকে যাওয়া উচিত। ওঁর গেস্ট হয়ে।

'খরচার কথা চিন্তা করবেন না। উমিয়াম লেক দেখুন। এলিফ্যান্ট ফল্‌স দেখুন। এক্ষুনি কলকাতায় ফেরার কী দরকার?'

আমি নিজেই নিজের গেলাসে বিয়ার ঢালি। জিজ্ঞেস আমি ভ্রমণপ্রিয় সেটা উনি জানলেন কী করে।

'উনি এবার গলা খুলে হাসলেন।

'সব বাঙালি বেড়াতে ভালোবাসে। এটা যে কোনো বোকা লোক জানে।'

আমি আরো খানিকটা বিয়ার গিলে ফেললাম।

'তাহলে বোকামি বন্ধ করুন। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ঘটা করে বিয়ার খাওয়ানোর আসল কারণটা বলুন।'

জানলার বাইরের ঠান্ডার মতো দেববর্মনের চোখদুটো ঠান্ডা হয়ে যায়। উনি হাততালি দেন। ঘরের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায় একের পর এক। বেশ বড় একটা বসার ঘর। কাঠের প্যানেল করা দেওয়াল। ইলেকট্রিক হলদে আলোর উপস্থিতি স্পষ্ট হয়। এমএলএ সাহেব উঠে চলে যায়।

ঘরে ঢোকে তারই মতো দেখতে, তার থেকে অনেক কমবয়সি এক মানুষ। যার সঙ্গে আমার কাছে লুকিয়ে রাখা নোংরা ছবির সুঠাম নগ্ন পুরুষের হুবহু মিল। আমার সামনের চেয়ারে বসে। তার সিগারেটের গন্ধটা তামাকের না গাঁজার আমি বুঝতে পারিনি।

পাঁচ

'নমস্কার। আমার নাম ববি বর্মন। আপনার কাছে যে ছবিগুলো আছে, সেগুলো দিলেই আপনি এখান থেকে বেরোতে পারবেন। আমার বাবা এমএলএ তাই খুব বেশি গোলমাল করতে চাই না। করতে বাধ্য করলে কী হবে আপনার কোনো ধারণা নেই।'

সচ্ছল ইংরেজি উচ্চারণ। ভালো ইংরেজি কনভেন্ট থেকে শেখা, সেটা স্পষ্ট।

আমি আমার বাংলা মিডিয়ামে শেখা ইংরেজিতেই বললাম যে আমার কাছে মাত্র একটা ছবিই আছে এবং সেটা এমন একজনের কাছে গচ্ছিত যে আমার কিছু হলে সেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী দেখতে পারবে। এবার উনি কী করবেন সেটা ওঁকে কল্পনা করতে হবে।

ঘরের নীরবতা বাইরের কুয়াশার থেকে গাঢ় হয়ে গেল। ববি চোয়াল শক্ত করে নিয়ে উঠে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়ায়। সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো, সাদা সোয়েটারের ভেতরে মেদহীন শরীরটা যে সত্যিই বলিষ্ঠ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার দিকে পেছন ফিরে, গলা নামিয়ে জানতে চাইল ছবিটা নিয়ে আমি কী করব?

'আপনার কাছে বেচার ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই আপনার ব্ল্যাকমেলারের মৃতদেহ দেখে পুলিশ ডাকতাম না!'

ববি বর্মন মাথা নামায়। আমার দিকে ঘুরে, আবার সামনের চেয়ারে এসে বসে। এবার খেয়াল করলাম উনি সত্যিই সুপুরুষ। চোখ হালকা নীলচে। 'আপনি ডিটেকটিভ?'

'আমার কলকাতার অফিসের বাইরের নেমপ্লেটটা তাই বলে। তবে ভিজিটিং কার্ড নেই।'

নীলচে চোখ এবার খানিকটা করুণ।

'আপনি কেন শিলং-এ এসেছেন আমি জানি না। হাজারিকার সঙ্গে কী

সম্পর্ক তাও জানতে চাই না। তবে আমি আপনাকে এক লাখ টাকা দেব। যদি আপনি ওই ছবিগুলো উদ্ধার করে আমাকে এনে দেন। প্লাস তদন্ত করার জন্য আপনার যা খরচা, থাকা, ইত্যাদি সব আলাদা। প্লিজ মিস্টার শর্মা, ওই ছবিগুলো আমার কতটা দরকার আপনি বুঝতে পারছেন? আমি যত অ্যাডভান্স চাইবেন এখনি দেব।'

একটা কেস করতে গিয়ে, এবার তৃতীয় মক্কেল। এবং পারিশ্রমিক ক্রমশ বাড়ছে। মনে মনে আমার তারাপদবাবুকে আবার প্রণাম করলাম।

'ছবিগুলো যতক্ষণ না খুঁজে পাচ্ছি টাকা নেবার ইচ্ছে বা অধিকার আমার নেই মিস্টার বর্মন। আর এই ঘরে আটকে রাখলে খোঁজ করার সম্ভাবনা কমছে।'

এমএলএ-এর সুপুরুষ পুত্র দু'বার হাততালি দিতে দরজাগুলো খুলে গেল। তিনি জানালেন যে তাঁর গাড়ি আমাকে শিলং ক্লাবের গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেবে। আমার জন্য একটা পুরো কটেজের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

'তার আগে যেটা জানা দরকার যে ছবিগুলো কোথায় তোলা হয়েছিল।'

উনি কলকাতার একটা ঠিকানা দিলেন। পাড়াটা আমার চেনা। এও জানালেন যে ওঁর একটা চামড়ার ব্যবসা আছে। প্রায় কলকাতা যান। মহিলা সম্পর্কে দুর্বলতা বহুদিনের। তবে যা কিছু কুকীর্তি সবই অসমের বাইরে। এইভাবে ফেঁসে যাবেন কখনও ভাবেননি। রতন হাজারিকার সঙ্গে পরিচয় শিলংয়েই। রতনবাবুর সঙ্গে কাজের সূত্রে বহুবার কলকাতায় গেছেন এবং রতনবাবুই তাঁকে নিয়ে যান কলকাতার ওই ঠিকানায়। লুইস বড়ুয়ার নাম কোনোদিন শোনেননি।

নীলচে চোখ এবার ছলছলে। 'প্লিজ হেল্প মি মিস্টার শর্মা। এই শহরের কাউকে এই ব্যাপারে নিযুক্ত করতে পারছি না। আমার থেকেও আমার বাবার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।'

এমএলএ বর্মনবাবুর বাংলো থেকে তাঁর ছেলের গাড়ি করে যখন বেরোলাম তখন দুপুর দুটো। কুয়াশা কমেনি। ঠান্ডা বেড়েছে। হঠাৎই আবিষ্কার করলাম চব্বিশ ঘণ্টার ওপর পেটে মদ ছাড়া কিছু পড়েনি। পুলিশ বাজারের কাছে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। রেস্তোরাঁর নাম 'লামি'। শুয়োরের মাংস, ডিম, ভাত, বেশ অনেক কিছু অর্ডার দিয়ে, এক পেগ রাম দিয়েই শুরু করলাম।

বর্ধমানের তারাপদ বোসের হবু জামাই চরিত্রবান এবং সচ্ছল কি না জানার জন্য, এখন আরও দুটো মক্কেলের প্রয়োজন মেটাতে, শিলং-এ এসে পাঁচটা নোংরা ছবি উদ্ধার করার তদন্তে জড়িয়ে পড়ব কল্পনাও করিনি।

বাইরে ঠান্ডা পড়ছে। অর্ডার দেওয়া খাবার পুরোটা শেষ করা যাবে না তাই অর্ধেক খাবার পর বাকিটা প্যাক করে সঙ্গে নেব কি না ভাবতে ভাবতে রেস্তোরাঁর বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরাতে যাবার সময়ই লক্ষ করলাম। রেস্তোরাঁর বাইরে, রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা কালো চামড়ার জ্যাকেট আর হ্যাট পরা লোকটিকে। গত রাতের ক্যাসেল রোডে আমার পেছনের ছায়ার মতো শরীর, এক কথায় থান ইটের বস্তা। চোয়ালের ব্যথাটা বেড়ে গেল। আমি রেস্তোরাঁয় ঢুকে, কোনোমতে দাম মিটিয়ে, রেস্তোরাঁর রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে, পেছনের গলিতে বেরিয়ে আসি। এবার হ্যাট পরা ইটের বস্তা আমার থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

রাস্তায় গাড়ি আর অটোর জ্যাম। তাই সেগুলো পেরিয়ে, তার নজর এড়িয়ে ঠিক তার পেছনে গিয়ে, ড্যানি ব্যনার্জির পিস্তলটা তার পিঠে ঠেকাতে আমার ঠিক কুড়ি সেকেন্ড লেগেছিল।

'আপনি যদি লুইস বড়ুয়া হন তাহলে আমি যা বলছি না শুনলে গুলি চলবে। যদি না হন তাহলে আপনার সস্তার সিগারেট-এর বদলে একটা দামি সিগারেট খাওয়াব।'

ইটের বস্তার কনুইয়ের গুঁতো লোহার রডের মতো। আমি ফুটপাতে পড়ে যাই। ইটের বস্তা উধাও হয়। লোকজন ভিড় করার আগে, ড্যানির পিস্তল আমার জ্যাঠার পুরোনো জ্যাকেটের পকেটে।

আমার হোটেলে পৌঁছে, রিসেপশনিস্টকে জানালাম আমি হোটেল ছাড়ছি। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে। শিলং ক্লাবে যাব।

রিসেপশনিস্ট জানাল কলকাতা থেকে আমার আত্মীয় আমার ঘরে অপেক্ষা করে আছে।

ঘরে ঢুকে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে, জানলার কাছে তারাপদবাবুর একমাত্র মেয়ে চন্দ্রিমা'কে বসে থাকতে দেখে আমি চমকে যাইনি। বরং খারাপ লেগেছিল।

ছয়

বর্ধমানের ইনসিওরেন্স এজেন্টের একমাত্র মেয়ে একটা আকাশি রঙের লম্বা কোট, কালো প্যান্ট আর গাঢ় নীল রঙের হাই হিল জুতো পরে একটা সিগারেটে টান দিয়ে আমাকে ঠান্ডা গলায় বলল, 'আপনি যদি আমার হবু বরের হয়ে এখানে আমায় খুঁজতে এসে থাকেন তো কোনো লাভ নেই, আমি ফিরে যাচ্ছি না। আর যদি আমার নোংরা ছবি নিয়ে ব্ল্যাকমেলের খেলায় ঢুকতে চান তো ঝামেলা বাড়বে।'

আমি ঠান্ডা মাথায় জানালাম যে, আমাকে প্রথম নিয়োগ করেছে তার বাবা, এটা জানার জন্য যে, তার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত কি না।

নীল কোট জানলার কাছে উঠে যায়। আমার দিকে পেছন ফিরেই বলে, 'বাবাকে জানিয়ে দিন আমাকে নিয়ে চিন্তা না করতে। আমি ভালোই আছি।'

জানলার বাইরের পুলিশ বাজারের বিকেলের যানজটের কোলাহল সত্ত্বেও, তার গলার ভেতরের ক্লান্তি বা কষ্ট স্পষ্ট। আমি গোলাপি দেওয়ালে হেলান দিলাম।

'এটা জানাবার জন্যই আপনি এখানে?'

চন্দ্রিমা ঘুরে দাঁড়ায়। চোখের মাসকারা ধেবড়ে গেছে চোখের জলে, কিন্তু চোখ জ্বলছে।

'ওই বাকি একটা ছবি আমার চাই।'

আমি সহজভাবেই জানাই যে আমার আর এক মক্কেল সেটা পাবার জন্য অনেক টাকা দিতে রাজি।

'সেই টাকা আপনার প্রাপ্য নয়।'

'আপনার?'

নীল কোটের নিচে, লম্বা সুঠাম চেহারা আমার কাছে এগিয়ে আসে।

'আপনি আগুন নিয়ে খেলছেন। পরের ব্যাপারে নাক গলাতে গেলে কী হয় জানেন তো?'

আমি জানিয়েছিলাম তার সংলাপগুলো তার নীল লিপস্টিকের মতোই সস্তা।

আমার গালে একটা কড়া থাপ্পড়। গত রাতের মাথার তালুতে বাড়ি, চোয়ালে ঘুসি আর আজ দুপুরে পেটে কনুইয়ে গুঁতোর থেকে অনেক মোলায়েম।

আমি হাসি। জানাই যে পরের ব্যাপারে নাক গলানোর জন্য আমি পয়সা পাই। তার জন্য আমার নাম কাটা গেছে। এবং তারাপদবাবু অনেক কষ্ট করে আমাকে এক হাজার টাকা দেবেন শুধু এটা জানার জন্য যে তার একমাত্র মেয়ে সত্যিই সুখে, শান্তিতে ঘর করবে।

চন্দ্রিমা হাল ছেড়ে দিয়ে আমার খাটে বসে পড়ে। তার ঠোঁট কাঁপছে। চোয়াল শক্ত।

'আপনি এসবের মধ্যে ঢুকবেন না। মনে হয় আপনি ভদ্রলোক। আমার যা হবার হয়েছে। আমি নোংরায় ডুবে গেছি। তবে এটুকু বলতে পারি আমি ঠিক নিজের মতো করে সঠিকভাবে বাঁচার চেষ্টা করব। সময় লাগবে, তবে করব। যদি আপনি সত্যি ভদ্রলোক হয়ে থাকেন, তাহলে ফিরে গিয়ে বাবাকে জানাবেন আমি ফিরব না, কিন্তু ঠিক আছি এবং ঠিক থাকার চেষ্টা করব। বলবেন যে...'

কঠোর হবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও, চন্দ্রিমা একটা ২৭ বছরের মফস্‌সলের কেরানির অসহায় মেয়ে হয়ে গেল। তার নীল কোট, নীল লিপস্টিক, এবং উদ্দাম নগ্ন ছবি ছাপিয়ে, একটা সাধারণ মেয়ে হয়ে গেলো, যে সমাজের নোংরামির সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত।

আমার উনচল্লিশ বছরের একাকিত্বে ভরপুর শরীর আর মনের ভেতরের অনেক দিনের অব্যক্ত চাহিদাটা আমার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

আমি সময় নিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। যতটা যত্ন আমার হাতে আছে তাই দিয়ে ওর পিঠে হাত রাখলাম। ও হঠাৎ জ্বলে ওঠা আগ্নেয়গিরির মতো আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো কেঁদে ফেলল। নীল কোটের তলায় ওর নরম শরীরটা বুকের কাছে চেপে ধরতে মন্দ লাগেনি তো বটেই। বরং সস্তার গোয়েন্দা হবার এই ছোটখাটো সুখ-সুবিধে পুরোপুরিভাবে উশুল করে নেবার চেষ্টা করেছিলাম।

উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করার চেষ্টা না করেই, ওর নীল ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলাম। বেশ অনেকক্ষণ।

তারপর কী ঘটেছিল সেটা এই গল্পে, বা আমার জীবনে অপ্রয়োজনীয়। কারণ খাটের ওপর যখন তারাপদবাবুর অসহায় মেয়ের ওপর শুয়ে ওর নীল কোটের তলায় হাত ঢোকাই, ও হঠাৎ করে, জমজমাট বায়োস্কোপের পর্দায় বিরতি ভেসে ওঠার মতো, আমার হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দেয়।

'আমি নষ্ট মেয়ে, আমার গায় হাত দিলে পাপ হবে।' এরকম জাতীয় কিছু আশা করেছিলাম। উলটে, চন্দ্রিমা বেশ জোরে আমাকে ঠেলে উঠে বসে। তারপর দাঁড়িয়ে ওঠে। চোয়াল আবার শক্ত হয়ে যায়।

'আমি এসেছিলাম আপনাকে সাবধান করে দিতে। তাই বলছি, আপনি কলকাতা ফিরে যান। নইলে নাক নয় অন্য আরও বেশ প্রয়োজনীয় জিনিস কাটা যাবে।'

আমার কিছু করার আগেই তার হাত চলে যায় তার পায়ে। তারপর হাই হিল জুতোর বাড়ি আমার কপালে। এতটাই সজোরে যে ঘরের বেগুনি আলো মেরুন হয়ে যায়।

সাত

চন্দ্রিমা হোটেল থেকে বেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে, গতকালের ক্যাসেল রোডের ছায়া, অর্থাৎ ইটের বস্তার মতো লোকটার দিকে এগিয়ে যায়। ওরা দুজনে একটা ট্যাকসিতে উঠে পড়ে। আমি যখন কোনোমতে দৌড়ে একটা অটোতে উঠে সেই ট্যাকসিটাকে ধাওয়া করি, খেয়াল করলাম চন্দ্রিমার হাই হিলের দৌলতে আমার ডান চোখের ভুরু থেকে রক্ত পড়ছে।

বিকেলের শিলং-এর অজস্র অলিগলি পেরিয়ে, একটা খুবই সরু রাস্তার ভেতরে ট্যাকসি থামে। চন্দ্রিমা আর ইটের বস্তা একটা সাদামাটা, পুরোনো দোতলা বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়।

আমি বাড়ির নিচে একটা ওষুধের দোকান থেকে মাথায় একটা ব্যান্ড-এড লাগিয়ে জানতে পারি বাড়িটার মালিক, ওষুধের দোকানেরই মালিক, নাম শংকর হুসেন। দুই পুরুষ ধরে এই শিলং-এই আছেন। অমায়িক ভদ্রলোক। বাড়ির দোতলা লুইস বড়ুয়াকে ভাড়া দিয়েছেন প্রায় চার বছর। লুইসবাবু নাকি একেবারেই সুবিধের লোক নন। কিন্তু ভাড়াটা ঠিক সময় দেন। হুসেন সাহেব আমাকে একটা ব্যথার ওষুধ খাইয়েই ছাড়লেন। জানালেন তাঁর স্ত্রী বাঙালি এবং তিনি নিয়মিত বাংলা সাহিত্য পড়েন এবং বাংলা গান শোনেন। বিশেষ করে বাংলা গোয়েন্দা গল্প তার খুব প্রিয় এবং নীহাররঞ্জনবাবুর তৈরি গোয়েন্দা, কিরীটি রায় তার সব থেকে প্রিয়। আমি কলকাতার সাংবাদিক, এবং শিলং-এর বাঙালিদের নিয়ে একটা লেখা লিখছি জেনে তিনি আমাকে দু'কাপ চা খাইয়েই ছাড়লেন।

আমি, হুসেনবাবুর হাত থেকে রেহাই পাবার আগেই একটা বড় টয়োটা গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে ববি বর্মন সাদা জুতো জামা পরে বাড়ির দোতলায় উঠে যায়। সঙ্গে দুজন যণ্ডা লোক। যারা লাথি মেরে লুইস বড়ুয়ার ঘরের দরজা ভাঙে। ঢোকে। ভেতরে হুলুস্থুলকাণ্ড চিৎকার,

নানা রকমের আওয়াজ। আমি, ড্যানি ব্যানার্জির পিস্তলটা জ্যাঠামশাইয়ের জ্যাকেটের পকেট থেকে বার করে যখন ঘরে ঢুকি তখন লুইস বড়ুয়া পিস্তল নিয়ে আমার তৃতীয় মক্কেল, ববি বর্মনের বুকে চেপে বসেছে। চন্দ্রিমা তার নীল কোট খোলেনি। ববির দুজন পোষা মস্তান মাটিতে অজ্ঞান। আমি পিস্তল উঁচিয়ে লুইসের দিকে। লুইস হঠাৎ থমকে গেছে। ঘরের দেওয়ালে একটাই ছবি, একটা বাঘের।

পরিষ্কার বাংলায় বাঘের মতোই লুইস জানায়, 'আমি এই বোকাচোদা এমএলএ-র বোকাচোদা ছেলেটাকে গুলি করব। তুমি আমাকে গুলি করবে। তোমার হাতের টিপ ঠিক না হলে তোমার গুলিটা আমার কাঁধে লাগবে। তারপর কী হবে জানো? শালা কলকাতার সস্তা গোয়েন্দা!'

আমি ড্যানির পিস্তলটা লুইসের পেটের দিকে তাক করে বলি, 'কেউ কাউকে গুলি করবে না। কারণ তাতে বোকামি বাড়বে। ববি বর্মন আমার সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবে। কে সস্তার আর কে দামি সেটা বিচার হবে পরে। ঠান্ডা মাথায়।'

ঘরের টিউব লাইটের আলো বাড়ছে। বাইরের আলো কমছে। কী ঘটবে কেউ জানে না। তবে, আমি গুলি করলে মিস করব সেটা আমি জানি।

লুইস বড়ুয়ার পিস্তল ববির চোয়ালে সাঁটানো। তার মিস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তার গলার স্বর চড়ছে, 'শালা কত বড় ভুল করছ তুমি জানো? ওই নোংরা ছবি'র জন্য কত টাকা পাবে তুমি?'

আমি সত্য কথাটাই বললাম, 'মিস্টার বর্মন মারা যাবেই। আমার হাতের টিপ খুব খারাপ তাই হয় আমার পিস্তলের গুলিটা আপনার কাঁধে লাগবে, নয় আপনার পেছনে চন্দ্রিমার পায়ে। চন্দ্রিমা তুমি সরে যাও।'

'এই নোংরা এমএলএ-র ছেলের বদমাইসি আজ বন্ধ হবে।'

'তার আগে বোকামি বন্ধ হবে।' বলেই আমি গুলিটা করি। ঘরের টিউব লাইটটা লক্ষ করে। দু'বার। টিউব ভেঙে ঘর প্রায় অন্ধকার। লুইস বড়ুয়া আমার বোকামি দেখে হয়তো খানিকটা ঘাবড়ে যায়। সেই ফাঁকে ববি আমার পাশে চলে আসে। লুইসের দিকে পিস্তল তাক করে, ববি বর্মনকে জাপটে ধরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে, সোজা রাস্তায়। তারপর ববির টয়োটা গাড়ির ইঞ্জিন নড়েচড়ে জেগে ওঠে। ববি বর্মন পেছনের সিটে কী করছিল জানি না। তার পোষা মস্তানদের লুইস কী করেছিল সেটাও আমার অজানা।

তারা বোকার মতোই গাড়ির চাবিটা ঠিক জায়গায় ঝুলিয়ে রেখেছিল বলেই, ববির নির্দেশ অনুসারে রাস্তার ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে লেগেছিল প্রায় তিরিশ মিনিট।

ও, আর একটা কথা। লুইস বড়ুয়ার ঘর থেকে বেরোবার সময়, তার দরজার লক লক্ষ করে তৃতীয় গুলিটা চালিয়েছিলাম।

আট

শিলং ক্লাবের বিশাল কটেজে ঢুকে আমি বলি, 'আমার বেশি কিছু নেই কিন্তু যা আছে সবই আগের হোটেলে।'

ববি বর্মন জানায় যে সে ফোন করে দিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার ব্যাগ ঘরে পৌঁছে যাবে।

ঘর মানে প্রায় আমার ডাক্তার লেনের গোটা ফ্ল্যাটটাই একটা বসার ঘর। পাশে, আর একটা, তার থেকে একটু ছোট শোবার ঘর। আমার ডাক্তার লেনের শোবার ঘরের সাইজের একটা বাথরুম। সবটাই কাঠের। বসার ঘরের বিশাল কাচের জানলার বাইরে আকাশ লাল। অদূরে পাহাড়ের গায় আলোগুলো জ্বলে উঠছে। ঠান্ডা বেড়েছে, বাইরে। ঘরের ভেতরে হোটেলের কর্মচারী ফায়ার প্লেস জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ববি'র কথামতো বেয়ারা এক বোতল বিদেশি হুইস্কি, গেলাস, টেবিলে সাজিয়ে দিয়েছে। ববি বোতল খুলে দুটো গেলাসে হুইস্কি ঢালে। তারপর জানলার কাছে এসে আমার দিকে একটা গেলাস এগিয়ে দেয়। ঘরের অল্প আলোতে ওর ফরসা মুখ ফ্যাকাসে। 'থ্যাংক ইউ মিস্টার শর্মা।' আপনি না থাকলে আমি আজ মরে যেতাম।'

আমি ওর দিকে না তাকিয়েই গেলাস নিই। ও আমার দিকেই হয়তো তাকিয়ে ছিল।

'টাকা দিয়ে ছবি ফেরত নিচ্ছেন না কেন?'

'ওরা এক কোটি টাকা চাইছে। বাবা নিশ্চিত হতে পারছে না যে ওদের কাছে আরও অন্য ছবি আছে কি না। এতদিন ফোনেই কথা হচ্ছিল। আজ আমারই এক গুন্ডা ওদের আস্তানার ঠিকানাটা খুঁজে পায়...ভেবেছিলাম ভয় দেখিয়ে...'

বর্ধমানের চন্দ্রিমার বেপরোয়া হাবভাবের পেছনে একটা বাচ্চা মেয়ে

লুকিয়ে আছে সেটা টের পেয়েছি। এবার তেমনি, বেপরোয়া এমএলএ-র বদ উদ্ধত ছেলের মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলে আছে, সেটা জানলাম।

হঠাৎ কেঁদে ফেলল ববি বর্মন। টাল সামলাতে না পেরে প্রথম আমার ঘাড়ে মাথা। তারপর বুকের ওপর ওর মুখ। আমাকে জড়িয়ে ধরাতে টের পেলাম ওর সুঠাম শরীর বেশ নরম। ওর চোখের জলে আমার কালো শার্টটা ভিজেছিল। আমি গেলাসের হুইস্কি গলায় ঢাললাম। ববি আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটা সোফায় গিয়ে কান্না থামানোর বৃথা চেষ্টা চালায়। আমি নিজের গেলাসে আরও খানিকটা ঢালি, আর ওর গেলাসটা ওর হাতে গুঁজে দিই।

'আমি অসুস্থ মিস্টার শর্মা। অন্তত আমার বাবার তাই ধারণা।'

ববি বেশ সময় নিয়েছিল। আমি সংক্ষেপে সারছি। শিলং-এর সেন্ট অ্যান্টনি স্কুলে পড়ার সময় ববি আবিষ্কার করে সে সমকামী। তার ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ। শিলং-এর কলেজে পড়ার সময় একটি খাসি ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়। তার প্রেমের নোংরা ছবি কিনতে বাবাকে ভালোই খরচা দিতে হয়। তাই নিজের শরীরের চাহিদা পালটাবার জন্য জোর করে মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক করা। কলকাতার নানা হোটেলে। নানা ধরনের বেশ্যাদের সঙ্গে। চাহিদা কিছুটা পালটায়। এবং শেষমেশ কলকাতায় হাজারিকার সঙ্গে, হাজারিকার চেনা একটা ঠেকে গিয়ে, চন্দ্রিমার সঙ্গে বিপর্যয়। এবার এক কোটি।

চোখের জল মুছে, গলায় পুরো হুইস্কিটা ঢেলে দিয়ে ববি আর একটা গেলাস ভরে। আমি সিগারেট ধরাই।

'আপনি যদি আমার কেসের দায়িত্ব না নিতেন, আমি আজ আপনার সঙ্গে প্রেম করতে চাইতাম।...'

ডাক্তার লেনের ছাপোষা বাঙালি। 'বাইসেক্সুয়াল' শব্দটা শুনেছি। জীবনে প্রথম দেখলাম। জীবনে প্রথমবার অনেক কিছুই ঘটে। জীবনে কোনোদিন গোয়েন্দা হব ভাবিনি তবু হয়ে গেছি। আমার মৃত বসের পিস্তলটা আগের দুটো কেসে ব্যবহার করেছি। আজ সেটা শিলং-এর পাহাড়ে চালিয়ে একজনকে রক্ষা করলাম। সেই পুরুষ আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইছে। তার নোংরা ছবি উদ্ধার করার দায়িত্ব নেবার ইচ্ছে আমার নেই, সে তার বাপ যত টাকাই দিক না কেন। তবুও ববি বর্মনের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল কেন সেটা জানি না।...

বর্ষাকাল চলছে। আমাদের ম্যাকলয়েড স্ট্রিটের অফিসে ছাদ থেকে জল পড়ছে। আমি বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। ড্যানি ব্যানার্জি হঠাৎ ভেজা কাকের মতো ঘরে ঢোকে।

'কোথায় চললে? বসে যাও। বোতল বের করো কথা আছে।'

অফিসের পাশের বাড়ির স্যামুয়েল তার ট্রাম্পেটের রেওয়াজ শুরু করেছে। সূর্য বেশ অনেকক্ষণ আর এই চত্বরে নেই। আমি ড্যানির দেরাজ থেকে তার বোতল বার করে গেলাসে ঢাললাম। ড্যানি বকুনি দেবার আগেই নিজের জন্য আর একটা। ড্যানি ভেজা অবস্থায় গেলাস তুলে নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়।

'বুঝলে সুব্রত, মক্কেল বউকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়নি, ডিভোর্সও করতে চায়নি।'

'চায়নি কেন বলছেন স্যার, সে কোথায়?' বেঁচে আছে?

ড্যানি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় আমায় জাপটে ধরে বলে, 'এইজন্যই তুমি একদিন গোয়েন্দা হবে। এইজন্যই আমি তোমার মধ্যে একটা কিছু দেখেছিলাম। তাই চাকরিটা দিই।'

দুজনেই নিজেদের গেলাস শেষ করে নিজেদের সামলে নিই। ড্যানি জানায় মক্কেল আজ দুপুরে নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে। সে জানতে চেয়েছিল তার স্ত্রী সত্যিই তাকে ছেড়ে কারুর সঙ্গে সম্পর্ক করছে কি না। ড্যানি তার প্রমাণ এনে দেয়। সে আত্মহত্যা করে।

'আমি ওর বডি আবিষ্কার করি। শালা আমার বাকি টাকাটা তার সুইসাইড নোটের সঙ্গে রেখে গেছে। নিতে পারলাম না। পুলিশে খবর দিয়েছি। ওর বউকেও। ...তোমার এই মাসের মাইনেটা সামনের মাসে দেব। মাইন্ড কোরো না।'

অফিসের ছাদ মেরামত করার পরই ড্যানি গুলি খেয়ে মারা গেছে। অফিসের পাশের বাড়ির বুড়ো স্যামুয়েল এখনও তার ট্রাম্পেট বাজায়। ড্যানির নড়বড়ে ব্যবসার দায়িত্ব আমি নিয়েছি। ড্যানির মতো 'সত্যি' খোঁটাটা আমার কাছে 'নেশা' এবং 'পেশা'। তবে শুধুমাত্র টাকার জন্য কাজ করার তাগিদ আমার কোনোদিনই ছিল না। আজ একটা মোটামুটি গোয়েন্দা হয়েও সেই তাগিদ অনুভব করি না। তাই যখন ববি বর্মনের বাবা, এমএলএ প্রমোদ বর্মন হঠাৎই আমার শিলং ক্লাবের কটেজে এসে উপস্থিত হন, তার পোষা গুন্ডাকে নিয়ে, তখন আমার মন যা চেয়েছিল তাই করেছি। তাই বলেছি।

এমএলএ বর্মন তাঁর পোষা গুন্ডাকে সরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসেন।

'আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে যদি ভেবে থাকেন মাথা কিনে নিয়েছেন তাহলে ভুল করছেন মিস্টার শর্মা। ওই খারাপ মেয়ে আর তার শাগরেদের কাছে আমার ছেলের যাবতীয় যা ছবি আছে সব আমাকে দিয়ে তবেই এই শহর থেকে আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন।'

'নইলে?'

আমি ঠান্ডা মাথায় নিজের হুইস্কির গেলাস ভরতি করি। ববি সোফায় বসে, দু'হাতে মাথা ঢেকেছে।

'নইলে কী হবে সেটা থানার আইসি বোরা আপনাকে জানিয়ে দেবে। ববি ওঠ।'

ববি নীরব।

'আপনাকে আমি ঠিক আর একটা দিন সময় দিলাম। ববি!!'

ববি উঠছে না তাই বর্মনবাবুর পোষা গুন্ডা কিংবা ড্রাইভার তার ছেলেকে টেনে তোলে। 'আমি যাব না।'

ববি নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে। তার বাবা সজোরে তাকে একটা থাপ্পড় মারে। ববি তার বাবার হাঁটু দুটোর দিকে হাত বাড়ায়।

'বাবা আমি আজ এখানেই থাকব। আমি এখানে, এই লোকটার কাছে সেফ ফিল করছি। আমি কথা দিচ্ছি আমি আর কোনো খারাপ কিছু করব না। এই লোকটা ভালো! আর আমি অসুস্থ নই।'

আবার সজোরে থাপ্পড়। আমি ড্যানির পিস্তলটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বার করতে বাধ্য হই।

'প্রমোদবাবু, আপনার ছেলের কুকীর্তির ছবি আমি খুঁজে বার করে আপনার হাতে দেব কি দেব না, সেটা এখনও ঠিক করিনি। এবং না করলে আপনি কী করবেন সেটা কাল ঠিক করবেন। আজকের রাতের জন্য ববি এখানেই থাকবে। আমিও আপনারই পয়সায় এখানে থাকব। কাল তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি ঠিক দেব। বিশ্বাস না করলে আপনার পায়ে একটা গুলি করব। আপনি চিরকালের জন্য ল্যাংড়া হয়ে যাবেন। আমাকে থানার আইসি ফাঁসি দিয়ে দিলেও কোনোদিন সোজা হয়ে, দু'পায়ে হাঁটতে পারবেন না।'

এমএলএ প্রমোদ দেববর্মন তাঁর জীবনে কোনোদিন এই কথাগুলো

শোনেননি। না হলে স্রেফ আমার হাতের পিস্তলের জন্য অতটা ঘাবড়ে যেতেন না।

'ভুল করলেন।'

এইটুকুই। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাস। তার শাগরেদ ববিকে ছেড়ে দিয়ে পোষা কুকুরের মতো তার পেছন নেয়। বাইরের আকাশের রঙটা তখন পুরোটাই কালো।

ববি বর্মনের সঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি। ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি চান করতে যাই। গিজারের গরম জল সারা শরীরের অনেকটা ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবার পর খেয়াল করেছিলাম আমি প্রায় দু'দিন পর চান করলাম। বেরিয়ে এসে দেখি হুইস্কির বোতল প্রায় শেষ। মাতাল ববি বর্মনকে প্রায় পাঁজাকোলা করে শোবার ঘরের খাটে শুইয়ে দেবার সময় অস্ফুটভাবে ইংরেজিতেই বলেছিল; 'আমাকে ছেড়ে যেও না। বন্ধু তুমি। তোমাকে ভালোবাসি।'

আমি সরে আসার আগেই ও আমাকে জাপটে ধরে একটা চুমু খায়। প্রথমে আমার গলায়, তারপর ঠোঁটে। কেন জানি না আমি বাধা দিইনি। নিচু হয়ে, ওর ওপর ঝুঁকেই ছিলাম। ওর নীল চোখ থেকে জল উপচে পড়ছিল। কোনোমতে বলেছিল, 'আমি অসুস্থ নই। আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি। আজ একটা রাতের জন্য আমাকে জাপটে ধরে থাকো। প্লিজ। আমি কোনো অসভ্যতা করব না। শুধু আমাকে ছেড়ে যেও না। এই একটা রাত।' ...তারপর এলিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে।

তাকে কম্বল চাপা দিয়ে, বসার ঘরের হুইস্কির বোতলের তলানিটা গলায় ঢেলে যখন শিলং-এর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি তখন রাত প্রায় ন'টা।

ওষুধের দোকানের শংকর হুসেনের বাড়িতে পৌঁছতে লেগেছিল কুড়ি মিনিট। অটোতে। দোতলায় উঠে লুইস বড়ুয়ার ঘরে ঢুকতে দশ সেকেন্ড। অন্ধকার ঘরে ঢুকতে অসুবিধে হবে না জানতাম কারণ আমার পিস্তলের গুলিতে দরজার তালা ভেঙে গেছে। ঘরে কেউ থাকবে না জানি। কিন্তু কেন জানি মনে হয়েছিল লুইস বড়ুয়া এবং চন্দ্রিমা দুজনেই তাদের প্রাপ্য টাকা এমএলএ বাবুর কাছ থেকে জোগাড় না করা অবধি ঘরটা ছাড়বে না। এবং ধরে নেবে যে এমএলএ প্রমোদ দেববর্মন কিংবা আমি তাদেরই ধাওয়া করার চেষ্টা করব ছবিগুলোর জন্য। তাই ঘরটা তন্ন তন্ন করে না খুঁজে যখন আমি ঘরের

দেওয়ালের একমাত্র ওই বাঘের ছবির পেছনে সাঁটানো খান বারো নোংরা ছবি খুঁজে পাই, আমি অবাক হইনি।

ছবিগুলো নিয়ে শিলং ক্লাবের হোটেলে, আমার কটেজে পৌঁছতে লেগেছিল আরও আধ ঘণ্টা, কারণ একটি বাঙালি অটোওয়ালা পেয়ে গেলাম।

কটেজের দরজা আমি বন্ধ করেই গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখলাম খোলা।

অন্ধকার বসার ঘর পেরিয়ে, শোবার ঘরে ববিকে যখন দেখি তখন তার পরনে সবই আছে। কম্বল নেই। অতিরিক্ত, তার ডান হাতের শিরা দিয়ে অনেকটা রক্ত মেঝের কার্পেটের বেশ কিছুটা দখল করে আছে।

নয়

শিলং থানার লকআপের টিউব লাইট ঘিরে পোকা নাচে না। তবে দেওয়ালে অজস্র আরশোলা আর অনেক মানুষের শরীরের ফেলে দেওয়া অনেক কিছুর কড়া, বোঁটকা গন্ধ। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না। কিন্তু ভাবার অনেকটা সময় পেয়েছিলাম। তার মধ্যে কিছু সময় বমি করে কেটেছিল। আমার এই শিলং যাত্রার গল্পটা কিছুটা সাজিয়ে নেবার পরই লকআপের দরজা নড়ে উঠল।

আইসি সুরের বোরার ঘরের টেবিলের সামনে বসে গল্পের বাকি অংশটা বুঝতে পারি। এই বোকার ফাঁকে যা শুনলাম তা হল, ববি বর্মনের পোস্টমর্টেম বলছে আত্মহত্যা। মৃত্যুর সময় আমি সেই ঘরে ছিলাম না। তার সাক্ষী বাঙালি অটোওলা রমেন সামন্ত। পুলিশি নিয়মানুসারে আমাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে। বোরাসাহেব লজ্জিত। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি গাঙ্গুলির মারফত, কলকাতার অ্যাডিশনাল কমিশনার ফোন করে আমার সম্বন্ধে অনেক ভালো কথা বলেছেন। সব শেষে টেবিলে আমার জন্য এক কাপ গরম চা।

'প্রমোদবাবু আপনার বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর করেননি। তিনি খুব ভেঙে পড়েছেন। আসলে ছেলেটি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল। আপনি ব্রেকফাস্ট খাবেন?'

থানার বাইরে যখন বেরোলাম পরের দিনের সূর্য হেলতে শুরু করেছে। ঠান্ডা বাড়ছে।

কেন জানি না, প্রথমেই আমি ববি বর্মনের সেন্ট অ্যান্টনি স্কুলটা খুঁজে বার করে সেখানকার ছোট্ট গির্জাটায় গিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। সামনে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অসহায় ববি বর্মনের মুখটা

মনে পড়ল। ওর কথাগুলো। 'আমি এখানে এই লোকটার সঙ্গে থাকতে চাই। লোকটা ভালো। আমি অসুস্থ নই।'...

পেটের ভেতর থেকে দুঃখটা বুকে আসার আগেই, গির্জা থেকে বেরিয়ে অটো ধরে শিলং ক্লাবে আমার কটেজের বসার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। গির্জা থেকে বেরোবার সময় খেয়াল করেছিলাম আমার পেছনের ছায়াকে।

শিলং ক্লাবের কটেজের ভেতরে শোবার ঘরে ঢুকে, প্রথমে কিছুক্ষণ খাটের পাশে কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে গোটা গল্পটাকে আবার সাজালাম। ঘরের দরজার সামনে নিচু হয়ে, দরজার তলা থেকে ছেঁড়া গুটকার প্যাকেটটা কুড়িয়ে নেবার সময় খেয়াল করেছিলাম বসার ঘরের ছায়াটাকে। নীল কোট পরা ছায়া।

চন্দ্রিমা মাথা নিচু করেই সোফাতে বসেছিল।

'আপনাকে না জানিয়ে ঢুকে পড়লাম। সরি!'

আমি ঘরের ফোন থেকে দুটো কালো কফি অর্ডার দিয়ে ঠিক ওর সামনের সোফাটাতে বসে আমার সস্তার সিগারেট ধরাই।

'থানা থেকে বেরোবার পর থেকেই আমার পিছু নিয়েছেন আপনি। একা? না কি লুইসবাবু বাইরে অপেক্ষা করছেন?'

চন্দ্রিমা কোনো চেষ্টা করেনি তার চোখের জল সামলাবার।

'সুব্রতবাবু, জীবনে অনেক খারাপ কাজ করেছি। লুইস আরও বেশি। কিন্তু আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। সেই ভালোবাসার মধ্যে কোনো মিথ্যে বা ফাঁক নেই। লুইস খুন করেছে দুজনকে...অনেক আগে। আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে। হাজারিকাকে সে মারেনি। ববি বর্মনকেও নয়। ছবিগুলো বেচে, আমরা আমাদের নোংরা অতীত ফেলে অন্য কোথাও গিয়ে ভালো করে বাঁচতে চাই।'

'ভালো করে বাঁচার দাম এক কোটি?'

'হ্যাঁ। কারণ এ দেশে থাকতে চাই না। নতুন করে অন্য দেশে, অন্য পরিচয় নিয়ে বাঁচতে গেলে অনেক খরচা। কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি ভালো লোক, তাই গতকাল লুইসকে গুলি করেননি। ববিকেও বাঁচাতে চেয়েছিলেন। ...তাই আপনাকেই সত্যি কথা বলছি। আপনার মতো সৎ, ভালো মানুষ আমি জীবনে পাইনি, পেয়েছি লুইসকে। যে আমাকে কলকাতার ওই খারাপ জায়গাটা থেকে নিয়ে চলে আসতে সাহায্য করেছে। আমি তাকে সত্যি ভালোবাসি।'

আমার সঙ্গে চন্দ্রিমার আগে দেখা হলে সে আমার সঙ্গে কী করত সেটা জানার আগ্রহ জিভের তলায় আসা সত্ত্বেও সেটা গিলে ফেলেছিলাম। বেয়ারা এসে কফি দিয়ে যায়। সেটাই গলায় ঢেলে দিই। বাইরের আকাশ আবার লালচে। চন্দ্রিমাই বলে।

'সুব্রতবাবু, ওই ছবিগুলো, এমএলএ বর্মনের গুন্ডারা খুঁজে পেয়েছে। আর আমরাও ঠিক করেছি ওই নোংরামির মধ্যে আর ঢুকব না। তাই একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।'

ঘরের ভেতরের নীরবতার ওজন বাড়ছে।

'আপনার অনেক কানেকশন। আপনাকে কেউ দুম করে কিছু করবে না। তাই আপনি যদি আমাকে আর লুইসকে আপনার গাড়িতে লুকিয়ে, আমাদের গুয়াহাটি অবধি পৌঁছে দেন? সেখান থেকে আমরা আমাদের ব্যবস্থা করে নেব। আমাদের আপনাকে দেবার মতো কিছুই নেই। আমার একটা সোনার আংটি আছে, যার দাম হাজার তিনেক হবে।'

এবার চতুর্থ মক্কেল। তারাপদবাবুর হাজার, হিরণ সান্যালের পঁচিশ হাজার, এমএলএ বর্মনবাবু এক লাখ, এবার চন্দ্রিমার তিন হাজার। বছরদুয়েক রোজগার না করলেও চলবে।

'আপনি যদি কাল চলে যান, আমরা পুলিশ বাজারে আপনার আগের হোটেলের কাছেই থাকব। আপনি কখন বেরোচ্ছেন জানলে ঠিক সময় ওখানে পৌঁছে যাব। আপনাকে অনেক, অনেক অসুবিধেতে ফেলেছি। কিন্তু এমএলএ বর্মনের এবং পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার আপনিই একমাত্র রাস্তা। আমরা দুজনে চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থেকে যাব।'

বর্ধমানের চন্দ্রিমার সঙ্গে ইটের বস্তার যদি দেখা না হয়ে আমার সঙ্গে হত? এই প্রশ্নটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আগেই বললাম, 'বিদেশে গিয়ে, অন্য পরিচয় নিয়ে নতুন জীবন শুরু করার ব্যাপারটা তাহলে হচ্ছে না?'

চন্দ্রিমা ভেজা চোখে আমার দিকে তাকাল; 'লুইস বলছে নোংরা ছবি বেচে সুস্থ জীবন সম্ভব নয়। কোনো একটা রাস্তা ঠিক বেরিয়ে আসবে। আমার ফোন নম্বরটা রেখে দিন। যদি দয়া করে সাহায্য করেন...তাহলে একটা ফোন করলেই হবে।'

চন্দ্রিমা, সূর্যের মতোই ঘর থেকে বিদায় নিয়েছিল। কুয়াশা, ঠান্ডা এবং

হ্যালোজেনের আলোতেই একটা ট্যাক্সি করে প্রমোদ বর্মনের বাংলোতে পৌঁছে যাই। একটা কালো পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরে এমএলএ সাহেব তার বসার ঘরে বসে দামি হুইসকি খাচ্ছিলেন। তাঁর পোষা সন্তান আমাকে ঘরে ঢুকতে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘরের আধো অন্ধকারে আমি নিজের চেয়ারটা খুঁজে নিই।

'ছবিগুলো যদি খুঁজে পেয়ে থাকেন তাহলে সেগুলো টেবিলে রেখে দিন। আমার সেক্রেটারি বাইরে আছে, আপনাকে এক লাখ টাকা দিয়ে দেবে।'

'ছবিগুলো আমার কাছেই আছে। বারোটা। তবে সেগুলোর দাম আপনাকে দিতে হলে টাকা দিয়ে হবে না। জেল খাটতে হবে।'

'মানে?' কথাটা বলার উদ্দেশ্য যদি বোমা ফাটানো হয়ে থাকে, তাহলে সে বোমা ফাটেনি, কারণ প্রমোদবাবুর গলা ভেঙে গিয়েছিল।

দশ

প্রমোদ দেববর্মনের বাংলোর বাইরে সন্ধে নেমে এসেছে। এমএলএ সাহেব তার মৃত ছেলে ববি বর্মনের কষ্ট পাচ্ছিলেন কি না তা বুঝতে দেননি। তার দেশি, বিদেশি হুইসকিতে মন দেন। চুপ করেই। আমার দিকে না তাকিয়ে।

আমি পায়ের ওপর পা তুলে, খানিকটা আমার মৃত বস ড্যানি ব্যানার্জির মতোই বলেছিলাম যে তাঁর পোষা গুন্ডাদের দিয়ে তিনি গতকাল রাতে, তাঁরই ভাড়া করা, আমার শিলং ক্লাবের বাংলোতে পাঠিয়ে,. তাঁর নিজের ঘুমন্ত ছেলের হাতের নাড়ি কেটে দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ববি আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু মুশকিল হল তাঁর পোষা গুন্ডার একজন তার গুটকার প্যাকেটটা ঘরে ফেলে আসে। এবং সেই গুন্ডাই গতকাল আমাকে এখানে নিয়ে আসার সময় একই গুটকা খাচ্ছিল। এখনও ঘরের বাইরে সেই একই গুটকা খাচ্ছে।

...

তারপর যা বলি, সব মিথ্যে কথা।

'এটা নিয়ে মামলা হলে কোর্টে প্রমাণ করা মুশকিল যে আপনিই খুনি। কিন্তু আমি মামলা করব। কলকাতার অ্যাডিশনাল কমিশনারকে জানিয়েছি। তিনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন। আমাকে বলেছেন শিলং থানায় এফআইআর জমা করতে। আমাকে পুঁতে ফেললেও, মামলা একটা হবেই। তাতে আপনার ভবিষ্যৎ কতটা অন্ধকার হবে সেটা ভেবে নিয়ে যা করার করুন।'

প্রমোদ দেববর্মন চুপ। সেই 'চুপ থাকার' ওপর আর একটা শিলং শহর বসানো যায়।

আমি উঠে গিয়ে তাঁর টেবিল থেকে বিদেশি হুইস্কির বোতলের খানিকটা একটা খালি গেলাসে ঢেলে নিই। গলায় ঢালি। মনের তিক্ততা একটু কমে।

আমি কেন কথা বাড়ালাম সেটা বাইরের কুয়াশাই জানে।

'আপনার ছেলে যদি সত্যিই অসুস্থ হয়ে থাকে তাহলে তার চিকিৎসার

দরকার ছিল, যেটা আপনি করাননি। তাই যেহেতু সেটা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাই অনেক ভোগান্তি আপনাকে সহ্য করতে হয়। যেরকম, আপনার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ক্ষমতার লোভ। সেই লোভের জন্য আপনি আপনার ছেলেকে গুন্ডা দিয়ে খুন করে সেটা আত্মহত্যা বলে চালাতে চেয়েছেন। তার নোংরামির ইতি করতে চেয়েছেন। আমি যদি বলি যে আপনি আপনার সন্তানের থেকে বেশি অসুস্থ? এবং আপনার জায়গা হাসপাতাল নয়, জেল, তাহলে কি খুব ভুল বলব?'

প্রমোদ বর্মন কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিলেন। আমি বলতে দিইনি।

'ববি আমাকে বিশ্বাস করে গতকাল রাতটা আমার কাছে কাটাতে চেয়েছিল। আমি তার নোংরা ছবি খুঁজতে গিয়ে তাকে বাঁচাতে পারিনি বলে নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব কি না জানি না। কিন্তু যেহেতু আপনি তাকে খুন করেছেন, তাই নিজেকে বাঁচাতে গেলে আপনার এক লাখ নয়, পঞ্চাশ লাখ টাকা গচ্চা যাবে।'

খাম ভরতি বারোটা নোংরা ছবি আমি প্রমোদবাবুর টেবিলে ফেলে দিই। ছুড়ে।

'আপনার সেক্রেটারি এই মুহূর্তে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ লাখ টাকা জমা করবে। আমি শিলং ছেড়ে চলে যাব। আপনি আপনার রাজনৈতিক জীবন কীভাবে কাটাবেন সেটা আপনার ব্যাপার। আমাকে পুঁতে ফেললে মামলা!'

আধঘণ্টা পর দু'পেগ বিলিতি হুইস্কি খেয়ে আমি প্রমোদবাবুর বাংলো থেকে যখন বেরোলাম তখন চাঁদের রঙটা চন্দ্রিমার ঠোঁটের মতোই লাল।

এগারো

পরের দিন, শিলং ক্লাবের আমার বাংলো থেকে গাড়ি নিয়ে যখন পুলিশ বাজারের একটা ঘুপচি গলির ভেতর হ্যাট পরা ইটের বস্তা এবং চন্দ্রিমার সঙ্গে দেখা হল, তখন আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ লাখ টাকা।

হ্যাট পরা ইটের বস্তার সাহায্যে আমার ব্যাংকের একটা ব্রাঞ্চে পৌঁছে, আমার অ্যাকাউন্ট থেকে চন্দ্রিমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পঁয়তাল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ট্রান্সফার করতে সময় লেগেছিল প্রায় দু-ঘণ্টা।

দুপুরের রোদ কড়া ছিল। তাই ঠান্ডা একটু কম। আমার ভাড়া করা গাড়িতে করে গুয়াহাটি পৌঁছতে প্রায় সন্ধে। আবার আকাশ লালচে কালো।

গুয়াহাটি স্টেশনের বাইরে চন্দ্রিমা আমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। লুইস বড়ুয়া তার লোহার মতো দুটো হাত দিয়ে আমাকে বুকে জাপটে ধরেছিল বেশ অনেকক্ষণ। ডুকরে কেঁদেছিল আরও কিছুক্ষণ। ওদের আমি একটা দিল্লির ট্রেনে তুলে দেবার সময় চন্দ্রিমা বলেছিল, 'বাবাকে বলবেন আমি ভালো আছি, ভালো থাকব।'

লুইস বড়ুয়া চোখের জল মুছে শুধু বলেছিল, 'হংকং। চন্দ্রিমা ভালো থাকবে এটুকু বলতে পারি।'

স্টেশনের কোলাহল ছাপিয়ে, লুইস বড়ুয়ার হাতে চন্দ্রিমাকে তুলে দিয়ে, আমার প্রথম মক্কেলের কাজ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করতে আমার গর্ব হয়েছিল।

বর্ধমানের তারাপদবাবু চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যত যাতে সুখের হয়। তাঁর জামাই তাঁর মেয়ের সঠিক দায়িত্ব যে সঠিকভাবে পালন করবে সেটা নিয়ে কোনো দ্বিধা আমার ছিল না। আমার কাজ আমি গুছিয়ে শেষ করি, পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়। আমার মাথার তালুতে লুইসের বাড়ি, তার কনুয়ের গোঁতা....তার অনেক কিছু ভুলে গিয়ে, তাকে কিছু বলার আগেই সে বলেছিল, 'আপনি ভালো লোক! ভালো থাকবেন। আপনার ঋণ

আমরা কোনোদিন পূরণ করতে পারব না। হংকংয়ে গিয়ে কতটা কী রোজগার করতে পারব জানি না। তবে এটুকু কথা দিতে পারি চন্দ্রিমাকে আর কোনো খারাপ কাজ করতে দেব না। আর আমিও আর কোনো খারাপ কাজ করব না।'

ব্যস। ওইটুকু। তারপর ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

বারো

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টের কাছে একটা সস্তার হোটেলে ঢুকে পড়ি। পরের দিন প্লেন ধরে কলকাতায় পৌঁছে সোজা কেয়াতলার লোটাস অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে যখন পৌঁছলাম বিকেল প্রায় চারটে। ঝকঝকে নিয়ন আলোয় এজেন্সি জমজমাট। হিরণ সান্যাল তার লাল কাপ থেকেই কালো কফি খাচ্ছিলেন। আমার দিকে একটা নীল কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'সব ঠিকঠাক তো? কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি?'

আমি জানিয়েছিলাম শিলং-এ ভালোই ঠান্ডা পড়েছে এবং সেটা তিনি ভালো করেই জানেন!

'মানে?' সান্যালবাবু হঠাৎ ঝুঁকে পড়াতে, তার হাতের ধাক্কায় খানিকটা কালো কফি তাঁর সাদা টেবিলে ছলকে পড়ল।

আমি শান্তভাবেই ওঁকে বোঝাই যে শিলং-এ, হাজারিকার বাড়ির লিভিংরুমে যখন আমি হোঁচট খেয়ে পড়ি, তখন অ্যাশট্রেটা উলটে যায়, এবং একটা আধ পোড়া সিগারেটের টুকরো পাই, যে বিলিতি সিগারেটটা সান্যালবাবুর খুব প্রিয়। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না যতক্ষণ না ববি বর্মন তার কলকাতার নোংরামি করার ঠেকটা জানাতে গিয়ে লোটাস অ্যাডভারটাইজিং-এর ঠিকানাটাই দেন।

ঘরের নীরবতার গাঢ় নীল রঙটা কোনোমতে ফিকে করার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেন হিরণবাবু, 'আপনি কী বলতে চান?'

'পারলে আপনি একবার চান করে নিন। কারণ একবার গড়িয়াহাট থানার লকআপে ঢুকে গেলে মুশকিল। সেখানকার শৌচালয়ের অবস্থা খুব খারাপ।'...

শিলং-এর ক্যাসেল রোডে, রতন হাজারিকার বাংলো। সন্ধে সাতটা। ব্যালকনির বাইরের আকাশ অন্ধকার.। ঘরের ভেতরে হিরণ সান্যাল। সদ্য কলকাতা থেকে গুয়াহাটি হয়ে শিলং-এ পৌছবার জন্য খানিকটা অবিন্যস্ত তার চেহারা। উলটো দিকে রতন হাজারিকা। হিরণবাবুর গলা চড়ছে।

'চন্দ্রিমা আর ববি বর্মনের নোংরা ছবিগুলো আমার চাই। তাড়াতাড়ি।'

রতনবাবু হতবাক।

'মানে? আমরা পার্টনার। যা টাকা আসবে...'

কথা শেষ করতে দেন না হিরণবাবু, 'আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি আপনি এমএলএ দেববর্মনের কাছে এক কোটি টাকা দাবি করেছেন? তার মধ্যে কিছু ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন কি না জানি না। আমাদের কথা ছিল, আমাদের অন্য কেসের মতোই এখানে পঁচিশ লাখ চাওয়া হবে। আমরা ফিফটি ফিফটি ভাগ করে নেব। আপনি এতবড় গদ্দারিটা করলেন, আমার সঙ্গে?'

রতনবাবু মাথায় হাত দিয়ে সোফায় বসে পড়েন।

'আরে মশাই ওটা আমি করিনি, করেছে আপনার চন্দ্রিমা আর ওই শালা লুইস।'

'লুইস আপনার লোক। একদম বাজে কথা বাড়াবেন না। ছ'ছটা বছর ধরে এই ব্যবসা আমি একা খেটে দাঁড় করিয়েছি। আজ তিনটে মুরগি জোগাড় করে আপনি আমার সঙ্গে গদ্দারি করে বেরিয়ে যাবেন? ছবিগুলো দিয়ে দিন, নইলে অনেক বড় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

'আরে মশাই বিশ্বাস করুন। ওই লুইস আর আমার সঙ্গে নেই। সে আপনার চন্দ্রিমার সঙ্গে দল পাকিয়ে এসব করছে। আমি নিজেই ভাবতে পারিনি যে লুইস আমার জন্য তিন-চারটে লাশ ফেলেছে, সে আমার সঙ্গে গদ্দারি করবে। আপনার চন্দ্রিমা ওর মাথাটা খেয়েছে...'

'আমার চন্দ্রিমাকে আমি বুঝে নেব। আপনার নাটক বন্ধ করুন। ছবিগুলো নিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাব। সেগুলো আমি তুলিয়েছি, আমার জায়গায়। ছবির মালিক আমি। আজ থেকে আমাদের পার্টনারশিপ শেষ। ছবিগুলো!'

হিরণবাবু তাঁর দামি টুইড কোটের পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করেন। 'আমি দু'বার বলব না।'

রতনবাবু এক লাফে ব্যালকনিতে গিয়ে বারান্দা টপকাবার চেষ্টা করেন। হিরণবাবুর পিস্তলের গুলি খেয়ে বারান্দার রেলিংয়ের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে ব্যালকনিতে পড়ে যান।

হিরণবাবু তাঁর সেল ফোন বার করে সময়টা দেখে, নিরুপায় হয়ে একটা সিগারেট ধরান। সেটা টানটে টানতে, ঘরের এটা-ওটা ঘেঁটে ছবি খোঁজার

চেষ্টা করেন, তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে দরজার পেছনে লুকিয়ে পড়েন। তারপর আমি ঘরে ঢুকি। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। উঠে দাঁড়িয়ে রতনবাবুর লাশ আবিষ্কার করি। হিরণবাবু পেছন থেকে আমায় তার বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারেন। —আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।...

কেয়াতলার বিজ্ঞাপনের এজেন্সি জমজমাট। হিরণবাবুর চেম্বারে নীরবতার রং কালো।

'বর্ধমানের তারাপদবাবুর মেয়ের মতো আর ক'টা মেয়েকে আপনি বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়ে এভাবে ঠকিয়েছেন হিরণবাবু?'

আমি ঠান্ডা মাথায় নিজের সস্তার সিগারেট ধরাই। হিরণবাবুর মুখ ফ্যাকাশে। উনি ঘরের আবহাওয়ার রং পালটানোর চেষ্টাই করছেন না।

'আপনি ভেবেছিলেন আমি কলকাতার সস্তার টিকটিকি। আমার ঠিক আগের ফ্লাইটটা ধরে আপনি রতনবাবুর বাড়ি গিয়ে ছবিগুলো হাতিয়ে তাঁকে খুন করে পালাবেন। আমি ঠিক তার পরমুহূর্তে সেখানে পৌঁছে ফেঁসে যাব। এবং পুরো ব্যাপারটা চন্দ্রিমা আর লুইসের দিকে ঘুরে যাবে। কিন্তু সময়ের অভাবে ছবিগুলো আপনি খুঁজে পাননি। পেয়ে যাই আমি। আমি ফেঁসে গিয়েও বেরিয়ে আসতে পারি কারণ ববি বর্মন ছিল একজন সমকামী, সে আমাকে পছন্দ করে। আমাকে সব সত্যি কথা বলে দেয়। ববির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব না হলে আপনার ব্যবসার আসল চেহারাটা আমি জানতেই পারতাম না।'

আমার জ্যাঠার পুরোনো চামড়ার জ্যাকেটের পকেট থেকে ড্যানির রিভলভারটা বার করি বাঁ হাতে।

'পার্ক স্ট্রিট থানার থেকে খবর পেয়ে, গড়িয়াহাট থানার পুলিশ যে কোনো মুহূর্তে চলে আসবে। সুতরাং চানটা করে নেওয়াই ভালো।'

গড়িয়াহাট থানার ওসি শেখর সরকার তার দলবল নিয়ে আসে। গোটা অফিসের সবাই গ্রেফতার হয়। লোটাস এজেন্সির ওপরের তলার ফ্ল্যাটে, একটা সাজানো শোবার ঘরের নানা জায়গা থেকে লুকিয়ে রাখা ছ'টা ভিডিও ক্যামেরা পাওয়া যায়। এবং ওসি সরকারের আমাকে পছন্দ হয়। পিঠে একটা চাপড় মেরে বলেন, 'লাইনে ঢুকেই যখন পড়েছেন, পিস্তলের লাইসেন্সটা করেই ফেলুন। আমি করিয়ে দেব। চালাতে পারেন তো?'

আমার ১১/৭ ম্যাকলয়েড স্ট্রিটের অফিসে যখন ঢুকেছিলাম তখন রাত এগারোটা।

দেরাজ খুলে, ড্যানি যেখানে তার বোতলটা রাখত, সেখান থেকে আমার সস্তার রামের বোতলটা বার করে, ড্যানির চেয়ারে বসে, ড্যানির পিস্তলটা আমার কোলের ওপর রেখে, মদ খেতে খেতে মনে হয়েছিল ড্যানি ব্যানার্জির দৌলতে আমি 'কিছু একটা হতে পেরেছি।' সেই 'কিছু একটা' কারুর কাছে স্রেফ 'পরের নোংরা ঘেঁটে দু'পয়সা রোজগার করা, হতে পারে। আমার কাছে ঠিক কী জানতে গেলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড়ের শেষ দিকটা আবার পড়তে হবে।

পরের দিন সকালে, আমার অফিসের রোগা রত্নার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দিয়ে বলেছিলাম; 'আগামী কয়েক মাসের মাইনে, ইলেকট্রিসিটির বিল মিটিয়ে, ড্যানির বিধবা বউ মালাকে দশ হাজার পাঠিয়ে, আমার জন্য হাজার দশেক রেখে দিয়ে বাকিটা ব্যাংকে ঢুকিয়ে দাও।'

রত্না আনন্দে আমাকে জাপটে ধরেছিল। তারপর কী করত জানার অবকাশ হয়নি কারণ দরজার কাছে বৃদ্ধ তারাপদবাবু একটা ময়লা ধুতি আর পুরোনো হাফ সোয়েটার পরে দাঁড়িয়ে।

আমি তাঁকে বসিয়ে, নিচের চা-ওলার কাছ থেকে ডিমের অমলেট, টোস্ট আর চা খাইয়েছিলাম। হিরণবাবুর দেওয়া দশ হাজার টাকার অ্যাডভান্সটা তাঁর পকেটে গুঁজে দিয়ে বলেছিলাম। 'আপনার জামাই চরিত্রবান শুধু নয়, আপনার মেয়েকে রাজরানি করে রাখবে। এই টাকাটা আপনার জন্য পাঠিয়েছে চন্দ্রিমা। খুব জরুরি একটা কাজের জন্য তাকে হংকং যেতে হয়েছে। চন্দ্রিমাকে নিয়েই গেছে। হয়তো ওখানেই ট্রান্সফার হয়ে যাবে। একদম চিন্তা করবেন না। চন্দ্রিমা তার সুযোগ্য স্বামী খুঁজে পেয়েছে।'

তারাপদবাবু এরকমই একটা খবর আশা করেছিলেন বলে মনে হল।

'বাবার মন। একমাত্র মেয়ে। কী বোকামিটাই না করেছি হবু জামাইয়ের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে...লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। তবে আপনার খরচটা...'

আমি গোমড়ামুখো রত্নার দিকে না তাকিয়েই বলেছিলাম, 'ওই এক হাজার আপনার মেয়েই দিয়ে দিয়েছে।'


পুরীর সমুদ্রের
কালো জল

সিআইটি রোড, লেডিজ পার্ক-কে বাঁ দিকে রেখে, ডান দিকে সরু গলি দিয়ে, একটু পরে ডান হাতেই পার্ক গেস্ট হাউসটা খুঁজে পেতে লাগল, ঠিক চার মিনিট। এদিকে লোডশেডিং চলছে, নইলে আরও কম লাগত। দু-একটা বাড়ি থেকে আসা ইনভার্টারের আলোতে যতটা দেখা যায়।

গেস্ট হাউসের একতলায় রিসেপশনিস্টই নেই। কেউই কোথাও নেই। মক্কেলের কথা মতো দশ নম্বর ঘরটা দোতলায় খুঁজে পেতে লাগল আরও এক মিনিট। পকেট থেকে ড্যানি ব্যানার্জির পিস্তলটা বের করে দরজায় টোকা দিতে গিয়ে দেখলাম, সেটা খোলা। কাছেই কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। কোনো একটা বাড়ি থেকে ভেসে আসা টেলিভিশনের বাংলা মেগা সিরিয়ালের সাংসারিক ঝামেলা হঠাৎ তুঙ্গে। দরজাটা নীরবে খুলে যায়।

ভেতরে অন্ধকার। আমার সেল ফোনের টর্চটা জ্বালতে বাধ্য হই।

একটা ছিমছাম ঘর। একটা বিছানার ওপর আমার মক্কেল, সেন মহাশয়ের মুখের রং আমার টর্চ-এর আলোতে বেগুনি। তার পাশে একটা পিস্তল। যার বাঁটের রং বাদামি। আর দুজনের মাঝে মাটিতে বেশ খানিকটা রক্তের ওপর উপুড় হয়ে একটা লাশ।

হঠাৎ দুম করে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। মক্কেল ডুকরে কেঁদে ওঠে। অদূরে আর সেই কুকুর।

দুই

চল্লিশ বছরের অনন্ত সেন আমাদের ম্যাকলয়েড স্ট্রিটের অফিসের চেয়ারে বসে, বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর আমার চোখে চোখ রেখে বলে, 'মিস্টার ব্যানার্জি, আপনারা বডিগার্ডের কাজ করেন?'

আমি ড্যানি ব্যানার্জির খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বলি, 'না উনি ড্যানি ব্যানার্জি। আমার পার্টনার। একটা অন্য কেস নিয়ে ব্যস্ত। আমি সুব্রত শর্মা।'

আমাদের এই ছোট্ট এজেন্সির আরও একমাত্র কর্মী আমার সেক্রেটারি রত্না বাড়ি চলে গিয়েছিল নইলে 'হ্যাঁ, অবশ্যই' বলে ফেলত। আমি একটা সিগারেট ধরাই।

'আপনার বর্ডিগার্ডের প্রয়োজন হল কেন?'

সুঠাম চেহারার, আমারই বয়সি, কিন্তু অনেক ফরসা অনন্ত সেন। সরু ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত বিলিতি সিগারেট। চোখ দুটো কটা। ধোঁয়াটা আমার মুখেই লক্ষ্য করে ছাড়লেন।

'যদি বলি কেউ আমাকে মারতে চায়?'

আমি ওঁকে বোঝালাম যে 'যদি' শব্দের ভিত্তিতে আমরা কেস নিই না। এবং কে বা কেন কেউ তাকে খুন করতে চাইছে তার বিস্তারিত গপ্পোটা না জানা অবধি আমি কোনো সিদ্ধান্তই নেব না। তবে এক কাপ লাল চা খাওয়াতে পারি।

অনন্ত সেনের মুখ, অফিসের বাইরে গোধূলির আকাশের মতোই ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সোনার চেন পরা, ফরসা ডান হাতটা তার কোর্টের পকেটে ঢুকিয়ে একটা রুপোর বা রুপোলি রঙের হিপ ফ্লাস্ক বার করেন।

'এই সময় চা খাই না। আপনি মদ্যপান করেন?'

আমি জানালাম যে অবশ্যই করি তবে এখনই ইচ্ছে নেই। একটা গেলাস এগিয়ে দিই। উনি ফ্লাস্ক থেকে চুমুক দিয়েই বেশ খানিকটা গলায় ঢালেন।

গপ্পো যেটা দাঁড়াল তা হচ্ছে, অনন্তবাবু খুবই বড় বনেদি পরিবারের একমাত্র ছেলে। তাঁর বাবা শিশির সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদ থেকে রিটায়ার করে পুরীতে তাঁর পৈতৃক ভিটেতে থাকতেন। একটি অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। মা, মীনাক্ষী দেবী, বিশ্বভারতীর শিক্ষিকা, এখন রিটায়ার করে পুরীতেই থাকেন। অনন্তর লেখাপড়ার থেকে ব্যবসায় বেশি উৎসাহ ছিল। তাই পুরীতে একটা বড় হোটেল আছে। ব্যবসায়িক কারণে কলকাতায় আসতে হয়। হোটেলের ব্যবসার অনেক দিনের পার্টনার রতন রাউত-এর সঙ্গে মুনাফা নিয়ে ঝগড়া হবার পর রাউতবাবু ব্যবসা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন ছ'মাস ধরে। গুন্ডা দিয়ে খুন করার হুমকি। সেই গুন্ডা তাকে গত সপ্তাহ ধরে ফোন-এ হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এখন তার কলকাতায় একজন দেহরক্ষীর প্রয়োজন। যা খরচা লাগে দিতে রাজি।

'আপনারা পিস্তল রাখেন তো?'

গোটা হিপ ফ্লাস্ক শেষ। ওঁর সিগারেট প্যাকেটও। আমি আমার সস্তার প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে, বোঝাই যে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানো আমার সম্ভব নয়। উনি পুলিশকে জানিয়ে রাখুন। খুব প্রয়োজন পড়লে আমাকে ফোন করতে পারেন। তবে ক্যামাক স্ট্রিটে একটা সিকিউরিটির এজেন্সি আছে, যেখানে হয়তো চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বডি গার্ড ভাড়া পাওয়া যায়। সেই ঠিকানা আমি জোগাড় করে দিতে পারি।

আমাদের অফিসের বাইরে রাস্তার হ্যালোজেনগুলো জ্বলে উঠেছে। আকাশ লালচে কালো। মাইকের আজানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাশের বাড়ির বুড়ো স্যামুয়েল তার ট্রাম্পেটের রেওয়াজ শুরু করেছে। অনন্ত সেনের ক'টা চোখদুটো জলে ভরে উঠল।

'এখানে কোথাও একটু মদ পাওয়া যায়?'

আমার এককালীন সাংবাদিক জীবনে, আর অল্পদিনের গোয়েন্দগিরির দৌলতে নানা ধরনের মানুষের সাথে গা ঘষাঘষি হয়েছে। তাদের কখনও অদ্ভুত কখনও বেপরোয়া আবদার মেটাতে হয়েছে। মক্কেল না হয়েও, আমারই অফিসে বসে আমারই মদ খাওয়ার আবদারটা খুব একটা অদ্ভুত লাগেনি বলেই, আমার মৃত বসের দেরাজ থেকে আমার সস্তার রামের বোতলটা বার করে একটা গেলাসে ঢেলে, জল মিশিয়ে তার দিকে এগিয়ে

দিলাম সহজে। সেটা চোঁ করে প্রায় এক ঢোক গিলে নিয়ে যে প্রস্তাবটা এল সেটা কোনোদিন কল্পনাও করিনি।

'আমি আজ রাতটা আপনার সঙ্গে কাটাতে পারি?'

আমার জ্যাঠামশাইয়ের রেখে যাওয়া ডাক্তার লেনের ফ্ল্যাটে আজ অব্দি আমি কারুর সঙ্গে কাটাইনি। ছোটবেলা থেকেই প্রাণের বন্ধুর অভাব। আর প্রাণের বান্ধবীদের কাছ থেকে ল্যাং খেতে খেতে, কিংবা তাদের প্রত্যাখ্যান করতে করতে, ওই ফ্ল্যাটটা আমার একাকিত্বকে এতটাই আপন করে দিয়েছে, যে ওই ঘরটা কারুর সঙ্গে শেয়ার করব ভাবতেই পারি না।

'আপনার যত টাকা লাগে আমি দেব। শুধু আজকের রাতটা! কাল পুরী চলে যাব। সেটা আমার নিজের জায়গা। আজ বড্ড ভয় করছে।'

আমি নিজে একটা গেলাসে খানিকটা রাম ঢাললাম। অনন্তবাবুর জন্য আর একটা।

'মানে আমি কোনোভাবেই আপনাকে বিরক্ত করব না। কারণ কোথাও গিয়ে আপনাকে বিশ্বাস করে ফেলেছি।'

আমার এই তেমন কিছু না পাওয়া, অথচ নানা ধরনের লোমহর্ষক রোমাঞ্চে মোড়া জীবনের, সব থেকে বড় সম্পদ আমার একাকিত্ব। এবং আমার ডাক্তার লেনের বাড়ির একগুচ্ছ ভাড়াটেদের কাওতালি ছাপিয়ে, এই ঘরটা আমার সেই প্রাণের একাকিত্বের প্রতীক বলতে পারেন। সেখানে আমি ড্যানি ব্যানার্জির ভাষায় 'রাজা'!

'এই অফিসেও থাকতে পারি। যদি থাকতে দেন, আর সঙ্গে থাকেন। একটা রাত!'

আমাদের মতো গোয়েন্দাদের রহস্যের সমাধান করা ছাড়াও আরও এমন কিছু করতে হয় যেটা আমাদের মতো গোয়েন্দাদেরই কাজ।

অনন্তবাবুকে আর দু-পেগ মদ খাইয়ে। নানা ভাবে ভুলিয়েভালিয়ে বিদায় জানাতে লেগেছিল প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। তার মধ্যে উনি ওঁর নানা ব্যর্থ প্রেম, ওঁর সংসারের প্রতি অনীহা, ওঁর মায়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়া, আমাকে জাপটে ধরে কাঁদা, কৃতজ্ঞতায় বিভোর হয়ে আমার হাতে চুমু খাওয়া আরও অনেক কিছুই করলেন। টলতে টলতে ট্যাকসিতে ওঠার সময় আমাকে জোর করে ওঁর টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে বললেন; 'অনেক, অনেকটা হালকা করে দিলেন আমায়। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আর যদি কোনোদিন

পুরীতে আসেন, এবং আমি বেঁচে থাকি, তাহলে আমাকে ফোন করতেই হবে।'

ট্যাকসিটা চলে যাবার পর মনে পড়ল রত্নার গত মাসের মাইনে বাকি। হাজার পাঁচেক চাইলে ভদ্রলোক আরও বেশি খুশি হতেন, এবং আমার জাত যেত না। ঘণ্টা দুয়েক একজন অনেক টাকার মালিককে সান্ত্বনা এবং সাহস দেবার পারিশ্রমিক এই দুনিয়ায় পাঁচ হাজার, খুব একটা বেশি কি?

আমার একান্ত আপন ডাক্তার লেনের বাড়িতে একাকিত্বের আনন্দ ভোগ করা হয়নি। আরও দু-পাত্তর রাম আর আমার মেদিনীপুরের কাজের মাসি, মালতীদির হাতের খিচুড়ি আর ডিমভাজা খেয়ে, জমিয়ে একটা ঘুম দেবার মুখেই, ফোনটা চমকে উঠল।

অনন্তবাবুর ক্ষীণ কণ্ঠ। তিনি তাঁর গেস্ট হাউসের ঘরে বন্দি। বাইরে তাঁর খুনি দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে...

তিন

সিআইটি রোডের কাছে, অনন্তবাবুর গেস্ট হাউসের ঘরে আমাদের মতো গোয়েন্দারা যা করে তাই করলাম। প্রথমেই হাতে রুমাল জড়িয়ে মৃতদেহের পকেট হাতড়ে তার পিস্তলটা বার করে মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর অনন্তবাবুর বিছানা থেকে ওঁর পিস্তলটা তুলে ওঁর ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওঁর বেগুনি রঙের মুখের সামনে বসে বললাম, 'কী ঘটেছিল? মিথ্যে বললে আপনার ক্ষতি?'

উনি আমার হাতদুটো জাপটে ধরে বললেন, লাশ তাকে ফোন করে বলে সে আসছে। তিনি আমাকে ফোন করেন। পরমুহূর্তেই লাশ দরজার লক ভেঙে ঘরে ঢোকে। অনন্তবাবুর কোনো উপায় ছিল না। আগেই নিজের পিস্তলটা বার করেছিলেন। লাশ ঘরে ঢুকতেই সে গুলি খেয়ে লাশ হয়ে যায়। কারেন্ট চলে গিয়েছিল তাই লাশের মুখ দেখতে পাননি।

আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলি যে পুলিশকে সেটা না বলতে। আমাকেও যখন জানাননি, পুলিশকেও জানানোর প্রয়োজন নেই যে আপনার কাছে পিস্তল আছে। সঙ্গে একটা পিস্তল আছে অথচ আমার কাছে আসেন বডি গার্ড খুঁজতে পুলিশ কেন আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

'সুতরাং আপনার পার্টনার রাউত আপনার ব্যবসা থেকে চলে যাবার পর আপনাকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। তারপর কলকাতায় আসার পর থেকে এক অজানা ব্যক্তি। আপনি আমার কাছে আসেন। আমি কেসটা নিই না। আপনি রাতে এই লোকটির ফোন পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি আসার আগেই লোকটি দরজা ভেঙে ঢোকে। পিস্তল নিয়ে আপনাকে হুমকি দেয়। আপনাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। আপনি পিস্তল কেড়ে নিতে চান। আচমকা গুলি চলে। এই লোকটি নিজের পিস্তলের গুলিতে নিজেই মারা যায়। তারপর আমি আসি। বোঝা গেল? এই কথাগুলো ছাড়া আর অন্য কিছু বললে ফেঁসে

যাবেন। আমায় পুলিশ প্রশ্ন করলে আমিও ওই এক কথাই বলব। শুধু হাতাহাতি হবার, এবং গুলি চলার পর আমি পৌঁছেছি। বোঝা গেল?'

অনন্তবাবু জানতে চান যে হাতাহাতি কীভাবে প্রমাণিত হবে। আমি ওঁকে চোখ বুজতে বলি। তারপর গালে দুটো থাপ্পড় আর কপালে একটা ঘুসি মারি। অনন্তবাবুর ভুরু কেটে সামান্য রক্ত বেরোয়। ব্যাপারটা সামলে নেবার আগেই আমি মাটিতে পড়া লাশকে চারটে লাথি...আর তাকে চিত করে শুইয়ে অনন্তবাবুকে তার মুখে দুটো ঘুসি মারতে বলি, সজোরে। উনি বেশ সজোরেই তিনটি ঘুসি মারেন। ওঁর নিজের হাতেও লাগে। লাশের নাকটাও কাটে। লাশের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হবে। বেশ রোগা, চোয়াড়ে গাল আর চশমা। তাপ্পি মারা পুরোনো কোট দেখলে মনেই হয় না সে ভাড়াটে খুনি। তার পকেট হাতড়ে, তার মানি ব্যাগটা নিজের পকেটে পুরে, তাকে আবার রুমাল মোড়া হাতে, সযত্নে উপুড় করে শুইয়ে দিই। তারপর পুলিশ ডাকি।

চার

বেনিয়াপুকুর থানার ওসি অলোকবাবু আমার দিকে না তাকিয়েই বলেন; 'আপনি গোয়েন্দা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ...।'

'লাইসেন্স আছে?'

'আমার কাছে নেই। আমাদের অফিসের নাম ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি ম্যাকলয়েড স্ট্রিটে আমাদের এজেন্সি।'

অলোকবাবু খাতায় কী সব লিখছিলেন। এবার মুখ তোলেন। ঘরের নিয়ন আলোয় তার চৌকো চোয়ালে দাড়ি কামাতে গিয়ে কাটার দাগটা স্পষ্ট। ঠান্ডা চোখে, ধরা গলায় বলেন, 'ড্যানিদার এজেন্সি?'

সে বছর শরৎকালের বিকেলের হলদে আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের বদলে জমাট কালো মেঘ। যখন তখন বৃষ্টি। ভেজা ঠান্ডা। আমি সদ্য আমার ক্রাইম রিপোর্টারের চাকরি হারিয়ে, ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি-তে একটা সাময়িক চাকরি নিয়ে ঢুকেছি। আমার মদ্যপ বস যে লম্পট সেটা তখনও টের পাইনি। সে প্রায় দু'দিন হল একটা কেস নিয়ে বেপাত্তা। সর্দিগরমি নিয়ে রত্না বাড়িতে। দুপুরে অফিসের নিচে গণেশের দোকানে দুটো ডিমের রোল খেয়ে জমিয়ে ঘুমোচ্ছি। ড্যানি যে অফিসে ঢুকে তার মদের বোতল বার করে, টেবিলে পা তুলে মদ খেতে শুরু করেছে খেয়াল করিনি। স্বপ্ন দেখছিলাম প্রায় মাউন্ট এভারেস্ট-এর মাথায় উঠে পড়েছি। হঠাৎ আমার সামনের জার্মান সাহেব আমায় লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আমার কোমরের দড়িটা ছুরি দিয়ে কেটে দেয়। আমি ধড়মড় করে উঠে পড়ি। ড্যানি হাসে। ঠোঁটের লালা মুছে নিয়ে, 'সরি স্যার' বলে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম কেন জানি না। কিন্তু দাঁড়িয়েছিলাম বলেই ড্যানির ছুড়ে দেওয়া মোটা খামটা লুফতে সুবিধে হল।

'পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। যত্ন করে রেখে দাও। নিজের কাছে। অফিসে নয়। মক্কেলের টাকা। মক্কেল যদি খুনি সাব্যস্ত হয় তাহলে পুরোটা নেওয়া যাবে না।'

'মক্কেল নিজেই খুনি?'

'নিজে হয়তো করেনি। কোনো ভাড়াটে খুনি লাগাতে পারে। তবে যদি তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতেই হয় তাহলে তোমার আর রত্নার মাইনে বাদ দিয়ে বাকিটা পুলিশকে জমা দিতে হবে।'

আমি হাঁদার মতো টাকার প্যাকেটটা নিজের ব্যাগে ঢোকাই। ড্যানি গেলাস হাতে উঠে এসে আমার টেবিলে বসে।

'টাকার রং হয় জানো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

ড্যানি বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চশমার পেছনের চোখদুটোর দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। কেন জানি না বুকের ভেতরে কোথাও একটা নরম, মোলায়েম ব্যথা হয়। আমি মুখ নামাই। ও আমার 'হাতের ওপর হাতটা রাখে, আলতো করে। চেহারা যতটাই পোড় খাওয়া, হাতের ছোঁয়া ততটাই নরম।

'কী করে বুঝলে টাকাটা চোরাই টাকা নয়। মানে আমি টাকাটা চুরি করিনি?'

'মানে?'

'মানে, টাকাটা যে আমাদের মক্কেলের টাকা নয়, আমি কোথাও থেকে চুরি করে এনে তোমার কাছে লুকিয়ে রাখছি না, তার কী প্রমাণ? আমি বললাম বলে?'

'অবশ্যই। আপনি কেসটা নিয়ে অনেক দিন ধরে লড়ছেন। আপনি আমার বস্...আপনি...মিথ্যে বলবেন কেন?'

ড্যানির মুচ্‌কি হাসিটা হঠাৎ ক্লান্তিতে পরিবর্তিত হয়। জানলার বাইরের সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই ডুবে যাওয়া সূর্যের লালচে আলো এসে পড়ে ওর ভাঙাচোরা মুখে। ঘরের দেওয়ালে।

'সততা হচ্ছে আমাদের মতো গোয়েন্দাদের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু কারণ ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করার মানে কিন্তু সততা নয়। বোকামি।'

সময় নিয়ে, একটু একটু করে ড্যানি বলে প্রায় দশ বছর আগে যখন

সে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের খুবই খ্যাতনামা এবং বেপরোয়া গোয়েন্দা ছিল তখন তারই ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ তার কাছে দশ হাজার টাকার একটা খাম রাখতে দিয়েছিল। টাকাটা যার সে একজন নামকরা বিল্ডার। যার নানা কুকীর্তির জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়। যে অফিসার টাকাটা রাখতে দিয়েছিল সে এই বিল্ডার আগরওয়ালের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে তাকে সাসপেন্ড করা হয়। প্রায় লাখ দুয়েক টাকা আগরওয়ালের কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে পেয়েছিল। সেই দু-লাখের মধ্যে দশ হাজার ড্যানির কাছ থেকে পাওয়া যায়। ড্যানি প্রমাণ করতে পারেনি ও পুরো ব্যাপারটা জানতই না। ঘুষ খাবার বদনাম মাথায় নিয়ে ও চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়।

আগারওয়াল বেল পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এখন বাংলা বায়োস্কোপের প্রোডিউসার। ড্যানির ঘুষখোর পুলিশ সহকর্মী এখন সেই প্রোডাকশন কোম্প্যানিতে বড় টাকার মাইনে নিয়ে চাকরি করে।

'আমি বউয়ের গয়না বেচে এই এজেন্সিটা খুলেছি, সেখানে ন'মাসে মেরে কেটে একটা মক্কেল আসে। বর্তমান মক্কেলের জালি টাকার ব্যবসা।'

ড্যানি। আমার বসের সম্পর্কে ঘুষ খেয়ে চাকরি হারাবার গপ্পটা যে মিথ্যে জানতে পেরে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আমার ভেতরের উচ্ছ্বাস বা আনন্দটা বুঝতে পেরে ড্যানি আমার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে উঠে চলে গিয়ে, গেলাসে হুইসকি ঢেলে বলেছিল, 'একটা সিগারেট দাও।'

আমার সস্তার সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে ড্যানি বলেছিল 'সুনাম' বা 'বদনাম' আসলে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিজের কাছে, নিজের মাথাটা উঁচু করে রাখাটাই আসল। এবং একজন সত্যিক্যরের গোয়েন্দা কারুর কাছে কিছুই প্রমাণ করে না। কারণ সময় বা সমাজের নোংরা বাড়ে। সে যতক্ষণ সেই নোংরার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের মাথাটা, একান্ত নিজের কাছে উঁচু করে রাখতে পারছে, ততক্ষণই সে সত্যিকারের গোয়েন্দা।

'সমাজের কাছে কিছু প্রমাণ করার কোনো দায় আমাদের নেই সুব্রত।' একবার যখন কাউকে মক্কেল বলে আমরা মেনে নিই, তাকে যে কোনো কিছু থেকে বাঁচানো আমাদের কর্তব্য। পুলিশকেও সবসময় সত্যি কথা বলা যাবে না। কিন্তু...

ড্যানি ওর কালো চশমাটা পকেট থেকে বার করে পরে নেয়।

'...যদি মক্কেল কোনো গোলমাল করে তাহলে তাকে আইনগতভাবে পুলিশের হাতে তুলে দিতেই হবে।'

কেন জানি না প্রশ্ন করি, 'তার মানে পুলিশের লোকজনের সঙ্গে আপনার এখনও যোগাযোগ আছে?'

ড্যানি কালো চশমাটা কপালে তুলে একটা চোখ মারে।

'যোগাযোগ নয়...ভালোবাসা!'

বেনিয়াপুকুর থানায় ওসি অলোকবাবুর ঘরে আমি আর উনি ছাড়া কেউ নেই। অনন্তবাবু বাইরে। ঘরের টিউব লাইটের আলোর চারপাশে শ্যামাপোকা নাচছে। অলোকবাবু আমাকে বুঝিয়ে বলেন যে অনন্তবাবুকে গ্রেফতার করা হবে না। লাশ পোস্টমর্টমে যাবে। উনি পুরী যেতে পারেন আর অন্য কোথাও নয়। আমাকে যখন দরকার থানায় হাজিরা দিতে হবে। এবং ড্যানি ব্যানার্জি তার গুরু ছিলেন।

'একটা পিস্তলের লাইসেন্স-এর জন্য অ্যাপ্লাই করুন। না হলে মুশকিলে পড়ে যাবেন। ব্যানার্জিদার এজেন্সির দায়িত্ব যখন নিয়েছেন তখন সেটা সিরিয়াসলি করতে হবে। রাত তো অনেক হল, গাড়ি আছে?'

আমার শহরের পুলিশ আমাকে একটা পুরোদস্তুর গোয়েন্দা হিসেবে মেনে নেবে কোনোদিন কল্পনা করিনি। তার কারণ আমার মদ্যপ, লম্পট, বস ড্যানি ব্যানার্জিকে তারা ভালোবাসে। যাকে, তার অকাল মৃত্যুর পর আমি অনেক বেশি করে ভালোবাসি। ...এসব কথা ভাবতে ভাবতে, বেনিয়াপুকুর থানার বাইরে, রাত একটার সময় মনে হল আমি কয়েক ঘণ্টা আগে কত সহজে কতগুলো আইনের নিয়ম ভাঙলাম স্রেফ একজন উড়িষ্যার অসহায় বড়লোকের জন্য। যে আইনত ভাবে আমার মক্কেল নয়। তাকে ভালো করে চিনি না। কেন করলাম?

অনন্তবাবু পেছন থেকে আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'আমি কোনোদিন এই ঋণ শোধ করতে পারব না। কিছু টাকা আপনি নিন।'

তার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছিলাম। পরিবর্তে, তার হয়ে কয়েক দিন পর পুরীতে গিয়ে তার এক সময়কার পার্টনার, এখন বেপরোয়া শত্রুকে একটু বুঝিয়ে দিতে হবে যে আর কোনো গুন্ডাকে লাগিয়ে অনন্তবাবুর ক্ষতি না করতে। যা করার কোর্টে গিয়ে আইনগতভাবে করতে

হবে। খাওয়া থাকার খরচা আলাদা। এবং রাউতবাবুকে সাবধান করে দেওয়ার পর, আরও পঁচিশ হাজার টাকা।

আমার মক্কেলকে তার গেস্ট হাউসে পৌঁছে, আমার ডাক্তার লেনের বাড়িতে পৌঁছতে প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছিল। আকাশের রং তখন গোলাপি।

আমার একতলার ভাড়াটে, বাবলুদা দাঁত মাজতে মাজতে আমাকে জানিয়েছিল, রাতে উড়িষ্যা থেকে একজন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রায় এক ঘণ্টা বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করে চলে গেছে।

'খুব বড় দামি গাড়িতে বসেছিল। চুরুট খাচ্ছিল!'

আমার দোতালার ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় খেয়াল করলাম দরজাটা খোলা। সেটা নিয়ে না ভেবে, কোনোমতে জামা জুতো ছেড়ে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় ফেলে দেবার ঠিক আগে খেয়াল করি, বিছানার বালিশের তলায়, সযত্নে রাখা একটা চিরকুট।

'সমুদ্র ভালো লাগলে মন্দারমণি যান। পুরীতে আসবেন না। আপনার ভালোর জন্যই বলছি।'

পাঁচ

পুরীর সমুদ্রের এক অদ্ভুত রাজকীয় ব্যাপার আছে যেটা শুধু রাজার মতো মানসিকতার লোকেরাই বোঝে। আপামর বাঙালি টুরিস্ট সেই রাজকীয়তার মর্ম বোঝে কি না আমি জানি না। যেমন, দার্জিলিং শহরের রাজকীয়তা তারা একইভাবে বোঝে কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গোপালপুরের সমুদ্রের মধ্যে মাদকতা আছে যেটা পুরীতে হয়তো অনেকে খুঁজে পান না। গোপালপুরে তাঁরা একটু বেশি নির্জনতা খুঁজে পান। কিন্তু দার্জিলিং তো শুধুই পাহাড় নয়। একটা শহর। পুরীও তাই শুধু সমুদ্র সৈকত নয়, একটা শহর। গজা আছে। জগন্নাথ মন্দিরের বাইরে উন্মাদের মতো যানজট আছ। স্বর্গদ্বারের ভিড় আছে। পান্ডাদের পাগলামি আছে। হিপিদের গাঁজা খাওয়ার পাড়া আছে। সাহেবি বি এন আর এর সাবেকিয়ানা আছে। অজস্র বাঙালিদের বনেদি বাড়ি আছে। নুলিয়াদের আবদার আছে। পুরী একটা আর পাঁচটা শহরের মতোই শহর, যেখানে একটা সমুদ্র আছে যেখানে ডুবে যাওয়া শক্ত, কিন্তু ভেসে গিয়ে, দম আটকে মরে যাওয়া খুব সহজ।

স্টেশনে নেমে, অটো করে, ফুলনাকারা পাড়ায়, রতন রাউতের বাড়ি পৌঁছলাম যখন তখন সকাল এগারোটা। একটা উঁচু বাড়ির ছ'তলায় তার ফ্ল্যাট। বেল বাজাতে এক অত্যন্ত ভদ্র উড়িয়া ছেলে দরজা খুলে আমাকে তার প্রশস্ত বসার ঘরে বসতে দিয়ে, এক গেলাস জল দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল জানি না। বারান্দায় বেরিয়ে দূর থেকে গোটা পুরীকে দেখতে এবং একটা সিগারেট খেতে আমার কতটা সময় লেগেছিল মনে নেই। আমার পেছনে একটা গেলাসে জল ঢালার শব্দ। সেটা জল নয় জিন।

রতন রাউত বেশ ছিপছিপে লম্বা। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। শৌখিন চশমার ফ্রেম। সাদা লিনেনের প্যান্ট আর একটা সাদা পাতলা সোয়েটার জাতীয় কিছু। খালি পা। বেশ ফরসা। আঙুলের ফাঁকে একটা চুরুট।

'আপনি সুব্রত শর্মা। কলকাতার গোয়েন্দা? আমাকে, আমার এক সময়কার ব্যবসার পার্টনারকে হুমকি দিয়েছি বলে, এখানে যে আমাকে আরও কড়া হুমকি দেবার জন্য টাকা নিয়েছেন? কত টাকা?'

'দশ হাজার। আপনি অনন্ত সেনকে আর খুন করার চেষ্টা যদি না করার কথা দেন, তাহলে আরও পঁচিশ হাজার।'

রাউত সাহেব আমাকে জিন অফার করেন। আমি তাঁর হলুদ কাপে কালো কফি খাই। উনি খুব ভদ্রভাবেই আমাকে জানান যে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। আমি জানাই যে আমি কিছুই খুঁজছি না। যেটা ঠিক করি করব, সেটা করেই ছাড়ি। কারুর বাড়িতে বিনা অনুমতিতে ঢুকে হুমকির চিরকুট রেখে আসা খুবই নিচু মানের অসভ্যতা। এবং বিনা পয়সায়ও মন্দারমণি যাব না।

রাউত আরও একটু জিন ঢালেন, 'তাহলে খুঁড়ুন। আপনার মক্কেলের গর্তে কী আছে সেটা জেনে নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিন কোথায় গিয়ে কী করবেন। আমি আপনার বাড়ির বাইরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম সামনাসামনি কথা বলব বলে। বলতে পারেন নিরুপায় হয়েই আমার শাগরেদকে দিয়ে চিরকুটটা রেখে আসি। আপনার টেলিফোন নম্বরটা জানা থাকলে...'

'ফোনেই হুমকি দিতেন?'

রতন রাউতের সুসজ্জিত বসার ঘরের আবহাওয়াটা ক্রমশ মেঘলা হয়ে যাচ্ছিল। ঠান্ডা মাথায় পয়সা দিয়ে তিন পাত্তি খেলার মতো।

হঠাৎ রাউতবাবু তার তাস ফেলে দিলেন।

'শুনুন মিস্টার শর্মা। আপনি সত্যিই যদি একজন বুদ্ধিমান গোয়েন্দা হয়ে থাকেন তাহলে জেনে নিন যে অনন্ত আমাকে ঠকিয়েছে। এবং আমি ওর ক্ষতি করতে চাই। হুমকিও দিয়েছি, কিন্তু কাউকে পাঠিয়ে ওকে খুন করার চেষ্টা করিনি। আর যদি সস্তার টিকটিকি হয়ে পঁচিশ হাজার টাকার জন্য গায়ে পড়ে আমার ল্যাজে পা দেন তো এই পুরী থেকে জ্যান্ত ফিরে যেতে পারবেন না। অনন্তর মতো আমার এবং আমার শাগরেদেরও পিস্তল, ছুরি, অনেক কিছুই আছে। সুতরাং...'

'সুতরাং?'

রাউত দাঁড়িয়ে উঠে আড়মোড়া ভাঙে। ঘরের কোনে রাখা একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়...

'আমি আপনাকে ডবল টাকা দেব। পঞ্চাশ হাজার। অনন্ত সেনের হয়ে বোকামি করা বন্ধ করুন। ওর কাছে একটা লাল রঙের কভার দেওয়া নোকিয়া আই ফোন আছে। সেটা আমাকে জোগাড় করে দিন। সেরকম হলে পঞ্চাশ হাজার সত্তর হাজারও হতে পারে। আপনার কাজে দেবে।'

প্রথমে মনে হয়েছিল রতন রাউত বাংলা সিনেমার খলনায়ক হলে, বাংলা সিনেমা একটু জাতে উঠত। এখন মনে হল হলিউডেও উনি জমিয়ে দিতে পারেন। যদিও ওঁর ইংরেজি আমি শুনিনি। আর সিনেমাও খুব একটা দেখি না।

আমি উঠে পড়ি। কখন যে ওঁর বেয়ারা আর একটা কালো কফি একটা নীল কাপে দিয়ে গেছে খেয়াল করিনি। ট্রেনে কিছুই খাওয়া হয়নি তাই ওই ঠান্ডা কফিটাই খেয়ে নিলাম। দাঁড়িয়েই।

'ওই কাজটা আপনার পোষা গুন্ডার দল আমার থেকে অনেক ভালো করতে পারবে। আর আমার মতো লোকেদের নানা ঘাটের জল খেলে পেচ্ছাপের রং নীল হয়ে যায়। আসি?'

রাউতের ফরসা কান দুটো গোলাপি হয়ে যায়, 'আমি কিন্তু আপনার কোনো ক্ষতি করতে চাইনি। আপনিই বাধ্য করলেন।'

আমি বাইরের দরজাটা বাঁ হাতে খুলি, 'উড়িয়া ছবিতে পার্ট করুন। অন্যের ক্ষতি করার বদ অভ্যেসটা বন্ধ হয়ে যাবে। গোটা উড়িষ্যার লাভ হবে।'

তারপর বেরিয়ে, দরজাটা বেশ জোরেই বন্ধ করি।

ছয়

খুঁজে খুঁজে নিমাপাড়ার অনন্তর মিষ্টির দোকান থেকে গোটা চারেক দুর্দান্ত গজা আর চারটে নিমকি খেয়ে, দোকানেই খোঁজ করে অনন্তবাবুর বাবার পৈতৃক বাড়ির ঠিকানাটা জোগাড় করি। নিমাপাড়ার প্রায় সকলেই চেনে। তারপর অটো ধরে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। দুপুরের রোদ বেড়েছে। বরফের মতো ঠান্ডা জলে পা ভিজিয়ে, অনেকটা ঠান্ডা হাওয়া খেয়ে, অনেক ফেলে আসা কথা মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরে কতবার এই সমুদ্রে চান করেছি। জ্যাঠা বলতেন সমুদ্রে সাঁতার কাটা শিখলে কখনও ডুবে যাবি না। আমি হেদুয়ার জলে সাঁতার শিখেছি। জ্যাঠা বেঁচে থাকলে বলতেন ওই জন্যই জীবনে কিস্‌সু হয়নি। ডুবে গেছি। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকার জন্য পরের কেচ্ছা ঘেঁটে চলেছি। বাড়িতে কেউ অপেক্ষা করে নেই। পুরোনো হাত ঘড়িটা প্রায় খারাপ হয়ে যায় তবুও ফেলে দিতে পারি না। যদিবা একটা মজার বন্ধু জুটল, ড্যানি ব্যানার্জি, গুলি খেয়ে মারা গেল। তার নড়বড়ে এজেন্সির দায়িত্বটা নিয়ে কতটা কাজের কাজ করেছি সেটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল; চুলোয় যাক অনন্ত সেন।

কাঁধের ব্যাগ, জুতো, জামা, হাতঘড়ি সব খুলে, স্রেফ জাঙিয়া পরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম ঠান্ডা ঘোলাটে, উত্তাল সমুদ্রে। পাড় থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, ঘুরে ঘুরে চোখ বুজে সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলনায় আমি একা সুব্রত শর্মা। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। কড়া রোদ। অনন্ত সেনের বাবার অ্যাকসিডেন্ট হলো কেন? এবং অনন্ত সেনের কীসের ব্যবসা? রতন রাউত কেন লাল টেলিফোন চায়? কে অনন্তকে খুন করতে এসেছিল? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কেন ইট দিয়ে তৈরি করা হয়নি? ড্যানি ব্যানার্জির মা কি অ্যাংলো ছিলেন? আমার স্বপ্নে কেন বার বার একজন আমাকে পাহাড়

থেকে ফেলে দেয়?... এরকম হাজার হাজার প্রশ্নকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে একটা নিদারুণ নিশ্চিন্তি। একটা প্রায় যৌন আনন্দ। আমি, আমার উলঙ্গ শরীর আর সমুদ্র।...

যখন প্রায় আধ ঘণ্টা পর জোর করে সেই সমুদ্রের আদরকে উপেক্ষা করে, পাড়ে ফিরে এসে, গরম বালির ওপর বসে পড়ি; বুঝতে পারলাম আমার ভেতরে বেশ অনেক দিনের ক্লান্তি জমা ছিল, যা ভালোবেসে সমুদ্র শুষে নিয়েছে।

যখন বালি ভরতি, জামা, জুতো পরে, কাঁধে ব্যাগ নিয়ে, নিমাপাড়ার অন্তরঙ্গ রোডে প্রয়াত শিশির সেনের পুরোনো, বনেদি বাড়ি খুঁজে পেলাম তখন বিকেল চারটে।

কাজের লোক, একটা বিশাল বড়, বইপত্তরে ঠাসা বসার ঘরে বসিয়ে উধাও হয়ে গেল। আবার ফিরে এসে এক গেলাস জল রেখে গেল। আমি, সারা শরীরে বালি নিয়ে ঘুরে ঘুরে ঘরের নানা ফ্রেমে বাঁধা চিত্রকলা দেখতে দেখতে একটা গোটা সিগারেট শেষ করলাম। তারপর বারান্দায় গিয়ে নিচের বাগানের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম ঠিক কী কারণে এসেছি।

মীনাক্ষী দেবীর বয়স ষাটোর্ধ্ব হবে। একটা ঘিয়ে রঙের তাঁতের শাড়ি। কালো শেল ফ্রেমের চশমা। ছোট চুল। সম্পূর্ণ সাদা। সুশ্রী একেবারেই নয় বললে চলে, কিন্তু নজর দাবি করে।

'আপনি কোন্ কাগজের?'

'কলকাতার। প্রথম আলো।'

চায়ের সরঞ্জাম আসে। উনি যত্ন করে চা বানিয়ে দেন। আমি ওঁকে জানাই যে আমি কলকাতার বাইরে বা অন্য প্রদেশে বাঙালি সম্প্রদায় নিয়ে লিখছি। অনেক ক'টা লেখা। দার্জিলিং নিয়ে একটা লিখেছি। এখন পুরী নিয়ে। সেখানে অবশ্যই সেন ফ্যামিলির প্রসঙ্গ আসতে বাধ্য। কারণ উনি এবং ওঁর প্রয়াত স্বামীর বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজে একটা বড় অবদান আছে।

'উনি মারা গেলেন কীভাবে?'

'শেষ বয়সে যা হয়। একটু বেশি মদ্যপান করতেন। তখন বারান্দার রেলিংটা ভেঙে গিয়েছিল। মেরামত হচ্ছিল। খেয়াল করেননি। স্লিপ করে নিচে পড়ে যান। ...এসো নির্মল!'

ঘরে ঢোকেন এক প্রবীণ ভদ্রলোক। সাদা চুল। তারও কালো শেল ফ্রেমের

চশমা। সাদা খদ্দরের লম্বা পাঞ্জাবি এবং আলিগড়ি পাজামার নিচে ষাটোর্ধ্ব শরীর বেশ বলিষ্ঠ।

মীনাক্ষী দেবী আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নির্মলবাবু বিশ্বভারতীতে ছবি আঁকা শেখাতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। রম্য রচনাও লেখেন। ওঁদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। পুরীতে একটা ছোট বাড়ি কিনেছেন। অবিবাহিত।

দুজন প্রবীণ, অত্যন্ত শিক্ষিত, রুচিশীল মানুষের সঙ্গে পুরীর ইতিহাস, বাঙালি সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অবদান, আন্তর্জাতিকতা নিয়ে আলোচনা করতে করতে প্রশ্ন হয়েছিল আমার মক্কেল কি সত্যিই এরকম একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে? নাকি প্রায় সব বাঙালি সম্ভ্রান্ত, বনেদি পরিবারের পরের প্রজন্মটাই সমুদ্রের মতো ঘোলাটে।

'সমুদ্র-চান করে এলেন?'

মীনাক্ষী দেবীর হঠাৎ প্রশ্ন এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আমাকে বলতে বাধ্য করে, 'এখানে এসে ওটা না করলে হয়?'

নির্মলবাবু জানতে চান আমি কোথায় উঠেছি। আমি জানাই অনন্ত সেনের হোটেলে। মীনাক্ষী দেবীকে প্রশ্ন করি।

'উনি তো আপনারই ছেলে?'

মীনাক্ষী দেবী কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকে, জানালেন যে ওর ব্যবসায় মন বেশি। নির্মলবাবু উঠে গিয়ে বইয়ের র‍্যাকে মন দেন। প্রশস্ত ঘরে অনেকগুলো জানলা এবং লাগোয়া বড় বারান্দা থাকা সত্ত্বেও, ভেতরের আবহাওয়া ক্রমশ গুমোট হচ্ছে। মীনাক্ষী দেবী বাঙালি মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে কী একটা বলতে শুরু করেছেন। আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়েই জানতে চাই শিশিরবাবুর মৃত্যুর পর বাড়ির মালিক কি তিনি না তার বখাটে ছেলে।

নির্মলবাবু মীনাক্ষীদেবীর পেছনে এসে দাঁড়ান। মীনাক্ষী দেবী আমার দিকে তাকান। কণ্ঠস্বরের মোলায়েম সাবেকিয়ানা উধাও।

'কলকাতার সস্তার টিকটিকি হয়ে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে গেলে আপনার কতটা ক্ষতি হতে পারে আপনার ধারণা নেই। আমার একটা কথার দাম কতটা আপনি জানেন?'

আমি সহজভাবেই জানাই যে আমি তাঁর কথা কিনতে আসিনি, সুতরাং তার দাম জানার প্রয়োজন নেই।

'বেরিয়ে যান। আর দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না।'

'বাড়ির মালিক কে সেটা আপনি না বললেও আমি জেনে নেব। আমি ভালোভাবে আপনার পুত্রের ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিলাম।'

এবার নির্মলবাবু যোগ দেন এবং বেশ জোর গলায়।

'সাংবাদিক সেজে, মিথ্যে কথা বলে এখানে ঢুকে আমাদের অনেক সময় নষ্ট করেছেন। এবার যান।'

'সত্যিটা তো আপনারা জানেন। আমি সাংবাদিক নই জেনেও তো বাঙালির ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনার নাটকটা আপনারাও বেশ জমিয়ে করছিলেন। হঠাৎ সব দোষ আমার হয়ে গেল?'

'শুনুন সুব্রতবাবু,' মীনাক্ষী দেবীর গলাও চড়ল। 'আপনি আমার ছেলের হয়ে কীসের তদন্ত করছেন আমি জানি না, জানতে চাই না। তবে চাঁদেও কলঙ্ক আছে। সব পরিবারেই কিছু না কিছু গোলমাল থাকে। আমার ছেলের বেপরোয়া, অশালীন জীবন যাত্রা আমি আর আমার স্বামী মেনে নিতে পারিনি। তাই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে আমার স্বামী। তার কোনো ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'কেউ তাকে খুন করতে চাইলেও?'

'যে জীবন ও স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে তার ফল তাকে ভোগ করতে হবেই। আর কথা বাড়াবেন না। আসতে পারেন।'

আমি পকেট থেকে ড্যানি ব্যানার্জির একটা ভিজিটিং কার্ড ওঁর বসার ঘরের টেবিলে রেখে বেরিয়ে আসি। মীনাক্ষী দেবীর কটাক্ষের পেছনে হুমকিটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে স্টেশনে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরতে, প্রায় সন্ধে ছ'টা। ভাগ্যিস ট্রেন লেট ছিল, তাই ধরতে পেরেছিলাম।

কলকাতায় পৌঁছতে ভোর ছ'টা। হাওড়া স্টেশনের বাইরে একটা হলদে ট্যাকসিতে উঠতে গিয়ে পেছনে থেকে প্রবল ধাক্কা। সামনের ল্যাম্প পোস্টটা বাঁ হাতে ধরতে না পারলে একটা লরির চাকার তলায় চলে যেতাম।

আমার মক্কেলের কলকাতার গেস্ট হাউসের লাশের পকেটের মানি ব্যাগটা থেকে যে ভিজিটিং কার্ডটা পেয়েছিলাম, সেটা নিয়ে, তার অফিসের ঠিকানা খুঁজে লেনিন সরণিতে একটা পুরোনো বাড়ির চারতলার অফিসে পৌঁছে দেখলাম সেটার নাম; এমপায়ার সিকিউরিটি।

ভেতরে, একজন কড়া লাল লিপস্টিক মাখা ঠোঁট নিয়ে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন আমার অসুবিধে কোথায়? বললাম ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা

করতে চাই এবং অসুবিধেটা ভয়ঙ্কর জটিল। উনি হাসিমুখে আমাকে, তার বস্‌, তমাল রায়ের কাছে নিজে পৌঁছে দিলেন।

ছোট একটা ঘর। শীতকালেও এ. সি. চলছে। আমার থেকে অনেক লম্বা, অনেক বেশি বয়সের, অনেক মোটা, তমালবাবু তার অনেক ছোট চেয়ারে নড়েচড়ে উঠে বললেন, 'চা না ঠান্ডা?'

লাশের ভিজিটিং কার্ডের নাম ছিল বিপ্লব বসু। তাই জানতে চাইলাম তিনি কোথায়!

তমালবাবু কোনোমতে চেয়ার থেকে নিজেকে বার করে উঠে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে পেছন ফিরে জানালেন বিপ্লববাবু সাংঘাতিক ব্যস্ত। এবং আমি আমার সমস্যাটা তাকে জানালে আমার মুশকিল খুব সহজেই আসান হয়ে যাবে।

আমি শান্তভাবে তাকে বোঝালাম যে বিপ্লববাবু সম্ভবত বেঁচে নেই। তমালবাবুর উচিত কলকাতার মর্গে তার খোঁজ করার। বেনিয়াপুকুর থানার অলোকবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার রাস্তাটাও জানালাম।

তমালবাবু এবার নিজের টেবিলে একটা চাপড় মেরে জানতে চাইলেন আমি কে? আমি আবার ঠান্ডা মাথায় বোঝালাম যে আমি তারই মতো একজন সস্তার টিকটিকি। জানতে চাইলাম বিপ্লববাবুকে কে নিয়োগ করেছিলেন উড়িষ্যার অনন্ত সেনকে ভয় দেখাতে।

'আপনি গোয়েন্দা তার কী প্রমাণ? আমাদের এজেন্সির বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মক্কেলদের ব্যক্তিগত ব্যাপার যাকে তাকে জানানোর কারবার করি না কোনোদিন। আপনার পিস্তল আছে? আমার আছে।'

আমি আবার ঠান্ডা মাথায় ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে বিপ্লববাবুর বাড়িতে একটা খবর দেওয়া উচিত। এবং তাঁর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন।

'আপনি কতবড় গোয়েন্দা সেটা আমার জানার প্রয়োজন নেই। বিপ্লব একটা খুব জটিল কেস নিয়ে ব্যস্ত। আপনি আমাকে হেনস্থা করতে চাইলে তার ফল ভালো হবে না। আমাদের এজেন্সি পঞ্চাশ বছরের পুরোনো।'

প্রায় আধঘণ্টা নানান নাটক, কথাবার্তা, তর্ক এবং বোকামি পেরিয়ে যখন কাজের কথায় এলাম তখন তমালবাবু তাঁর ঘরের এ.সি বন্ধ করে দিয়ে কাঁদো কাঁদো।

'বিপ্লব শালা বহুত হারামি। আমার পেছনে আমাকে না জানিয়ে নানা কেস নিজেই নেয়। আমাকে কিছুই জানায় না। সে কার হয়ে কাজ করছিল আমি জানি না, বিশ্বাস করুন। আমরা বড়লোকের বাড়িতে দারোয়ান সাপ্লাই করি। বিপ্লব নিজেকে ব্যোমকেশ বক্সি ভাবত। ইংরেজি ছবি দেখত। ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আপনি দয়া করে পার্ক স্ট্রিট থানায় ফোন করবেন না।'

ক্লান্ত শহর। শীতকালের পড়ন্ত আলোতে আরও ক্লান্ত লাগে। মানুষকে কত রকমভাবে রোজগারের জন্য কত কিছু করতে হয়। আজান, ট্রাম, বাস, গাড়ি, হকারদের ব্যাকুলতা, সবকিছুর মধ্যেই একটা ক্লান্তি লুকিয়ে আছে। একটা চাপা, না পাওয়ার রং।

বিপ্লববাবু আমারই মতো একজন সস্তার গোয়েন্দা। এটা পুরী যাবার আগেই জানতে পারতাম, যদি তাঁর মানিব্যাগটা একবার লক্ষ করতাম। সেটা পুরী গিয়ে, ফিরে এসে, আবার রাতে পুরীর ট্রেন ধরার পর যখন ভাবতে বসেছি, তখন আমারও বেশ ক্লান্ত লাগছে। তিনি কি সত্যিই আমার মক্কেলকে খুন করতে চেয়েছিলেন? নাকি আমার মতোই রতন রাউত তাকে অল্প টাকায় ভাড়া করেছিল অনন্তবাবুকে ভয় দেখাতে। আমার বাড়িতে কেউ অপেক্ষা করে নেই। বিপ্লববাবুর বাড়িতে কি কেউ আছে? ছেলে? বউ? তারা জানেই না তিনি লাশ হয়ে পড়ে আছেন মর্গে।

গতকাল নিমাপাড়ার গজা ছাড়া আর কিছুই খাওয়া হয়নি। বেশ রাতের দিকে বালাসোরে নেমে, ঘুম চোখে স্টেশনের বাইরের দোকানে কচুরি আর ডাল খাওয়ার সময় খেয়াল করলাম অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ লম্বাচওড়া লাল মাফলার পরা লোকটিকে। আমার পাশের কামরা থেকে নেমে, আমার ওপরই লক্ষ রাখছে প্রায় মিনিট দশেক ধরে। কচুরি ফেলে সোজা তার দিকে এগিয়ে গেলাম। সে খানিকটা এলোমেলো ভাবেই উলটোদিকের ট্যাকসি স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল। আমি সোজা তাকে দুটো ট্যাকসির ফাঁকে চেপে দিয়ে, ড্যানির পিস্তলটা তার কোমরে ঠেকিয়ে দিলাম।

'পুরী থেকে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন?'

তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। বালাসোরের স্টেশনের বাইরে দুটো খাবারের আর একটা পানের দোকান ছাড়া সবই বন্ধ। ট্যাকসিওয়ালা প্রায় সবাই গাড়ির ভেতরে কম্ফর্টার জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। দু'চারজন কুলি মজুর একটা

টায়ার জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে কেন কে জানে। আকাশের চাঁদ কতটা স্পষ্ট আমি খেয়াল করিনি?

'হাম কুছ নেই জানতা!'

আমি ড্যানি ব্যানার্জির পিস্তলটা ওর পেটের চর্বিতে আরও গুঁতিয়ে দিয়ে বলি, 'আপনি পেছন থেকে ভালো ঠেলতে পারেন সেটা সকালে হাওড়া স্টেশনের বাইরে বুঝেছি। আমি সামনে থেকে কীভাবে গুলি চালাই আপনি কিন্তু জানেন না। জানতে চাইলে, কে আপনাকে টাকা দিয়েছে আমার ক্ষতি করার সেটা বলতে হবে।'

আমার সামনে থেকে গুলি চালাবার ক্ষমতা লোকটার জানা হয়নি। আমারও না। কারণ ও সামনে থেকে আমার কুঁচকিতে বেশ জোরেই একটা গুঁতো মারে, ওর হাঁটু দিয়ে। আমি পিস্তল সমেত পেছন দিকে পড়ে যাই। আমার মাথাটা মাটিতে ঠুকে সবকিছু কিছুক্ষণের জন্যে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

সাত

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। লাল মাফলার ট্রেনে উঠেছিল কি না জানি না। আমাকে একটা ট্যাকসি ভাড়া করে পুরী পৌঁছতে রাত কাবার, এবং অনন্ত সেনের দেওয়া টাকা থেকে প্রায় দু'হাজার গচ্চা হয়ে যায়।

অনন্ত সেনের, এলাহি 'ব্লু বিচ' হোটেলে পৌঁছতেই আমার জন্য গতকাল থেকে অপেক্ষা করে থাকা ম্যানেজার প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে এক তলার একটা বেশ বড় বারান্দাওয়ালা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলে, 'পছন্দ না হলে একটা আরও বড় ঘর দিতে পারি! সুইমিং পুলের সামনে। আপনি গতকাল এলেন না যে?'

আমি কোনো মতে ম্যানেজার সামন্তকে বিদায় জানিয়ে, ঘরের মিনি ফ্রিজিডিয়ার থেকে একটা বিদেশি মদের মিনি বোতল এক ঢোকে সাফ করে দিয়ে, বিশাল বড় খাটে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার গতকালের জামা ভরতি সমুদ্রের বালি নিয়ে।

স্বপ্নে আমি মাউন্ট এভারেস্টের বদলে পুরীর সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ড্যানি ব্যানার্জি আমাকে কোলে করে পাড়ে নিয়ে আসে।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা টানা ঘুমিয়ে, রুম সার্ভিস-এ অর্ডার দিয়ে ডিম, পাঁউরুটি, নানা ধরনের ফল, কেক, কফি, আরও অনেক কিছু খেয়ে ফেলি। কালো মার্বেলের টাইল বসানো চান ঘরে গরম জলে চান করে, দাড়ি কামিয়ে, আবার বালি ভরতি জামা জুতো পরে নিই। হঠাৎ গোয়েন্দা হবার সুযোগটাকে হাতছাড়া করিনি বলে নিজের ওপর গর্ব হচ্ছিল। ঘরের বেল বেজে ওঠে। দরজা খুলে দেখি মক্কেল। তার চোখের দামি কালো চশমা। 'কেমন আছেন? কাল এলেন না?'

অনন্ত সেন এবং তার শত্রু দুজনেই কেন সাদা জামা কাপড় পরেন সেই নিয়ে না ভেবে, আমি যেটা বলার প্রয়োজন সেটাই বলি।

'আপনাকে কেউ খুন করতে আসেনি মিস্টার সেন। যে এসেছিল সে আমারই মতো একজন ছাপোষা, সস্তার টিকটিকি। তাকে কে নিয়োগ করেছিল আমি জানি না। তবে আপনি আত্মরক্ষা করার গপ্পোটা জমিয়ে বলতে পারেননি। আপনি যখন তাকে খুন করেন, তার পিস্তলটা তার পকেটেই ছিল।'

'তাহলে আমাকে বাঁচালেন কেন?'

'ধরে নিন, আসল সত্যিটা জানার জন্য। একটা কৌতূহল বলতে পারেন। যেটা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। একটা নেশা।'

অনন্তবাবু বলেন তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। এবং আমি তার অনুরোধে, তার খরচায় পুরীতে এসে আদৌ তার শত্রু রতন রাউতকে সাবধান করেছি কি না তিনি জানেন না। গোটা একটা দিন তিনি অপেক্ষা করেছিলেন আমার জন্য। এবং তিনি জানতে পেরেছেন যে তাঁকে না জানিয়ে আমি তার বাড়িতে গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করি। মিনাক্ষী দেবী তাঁকে ফোন করে আমাকে নিয়োগ করার ব্যাপারে বিচলিত। রতন রাউত তো তাকে ফোন করে আবার হুমকি দিয়েছেন। আমি গোটা একটা দিন পুরীতে এসে কী করছিলাম সেটা নিয়ে তিনি ভালোই বিচলিত। তিনি আমাকে বিশ্বাস করে আমাকে একটা কাজ দিয়েছেন। আমার জন্য, পুরীতে তার চার-চারটে হোটেল আমার দেখভাল করার জন্য প্রস্তুত। আমি কি তার হয়ে রতন রাউতের সঙ্গে আদৌ কোনো সমস্যার সমাধান করেছি?

মোদ্দা কথা। 'আপনি কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছেন? কলকাতায় আমার হয়ে এতটা ঝুঁকি নিলেন। আমি সত্যি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ! কিন্তু আপনি কি আমার কাজটা করতে চাইছেন না? বাকি পঁচিশ হাজারের কোনো দরকার নেই? আপনি কি এখন রতন রাউতের হয়ে কাজ করছেন?'

অনন্ত সেনের মুখ এবং গলার স্বর মিলিয়ে লোকটাকে একটু বিপজ্জনক মনে হলেও, তার চোখদুটো বেশ অসহায় লাগল। তাই, তাঁর মা, মীনাক্ষী সেনকে যে প্রশ্নটা করেছিলাম, সেটাই তাঁকে আবার করলাম।

'আপনার বাবা আপনাদের বাড়ির ভাঙা বারান্দা থেকে পড়ে যাবার পর, বাড়ির মালিক এখন কে? আপনি না আপনার মা?'

অনন্ত সেন হঠাৎ দম দেওয়া পুতুলের ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ার মতো থমকে গেলেন। ঘরের একটা সোফায় বসে পড়লেন। একটা দামি বিলিতি সিগারেট ধরালেন।

'আপনি কার হয়ে কাজ করছেন?'

'আপনার। আপাতত। তাই আপনার গোটা গল্পটার মধ্যে অনেক ফাঁক ফোকর থাকলেও সেটা নিয়ে ভাবছি না। 'আপনি ঝেড়ে কাশলে সুবিধে হয়। আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি তাই আপনাকে মিথ্যে কথা বলতে চাই না। আপনি মক্কেল হয়ে সত্যি কথা বলবেন কি?'

নীরবতা। বেশ ক্লান্তিকর একটা অস্বস্তি।

আমি ভেবেছিলাম গত দু'দিনের অনেক মিথ্যে'র পর একটু সত্যি কথার আলো দেখতে পাব। কিন্তু আমার মক্কেল সেই আলোটাকে আরও ঘোলাটে করে দিল।

'রতন রাউত আপনাকে ঠিক কী বলেছে?'

'কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে।'

'আপনি কি কেঁচো খুঁজবেন না যে কাজটার জন্য টাকা নিয়েছেন সেটা করবেন?'

'আমার কাজ আমি করছি বলেই আপনি এখনও জেলের বাইরে মিস্টার সেন। নইলে এখন আপনি বেনিয়াপুকুর থানা থেকে আলিপুর জেলে থাকতেন!'

'লোকটা সত্যিই আমার ক্ষতি করতে এসেছিল আমি গুলি না করলে ও আমাকে মারত!'

সংলাপ এগোবার আগেই আমার পকেটের টেলিফোন বেজে ওঠে। আমি সেটা বার করে কানের কাছে ধরে বেশ উৎসাহ নিয়েই বলি, 'বলুন মীনাক্ষী দেবী!'

অনন্তবাবু উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

মীনাক্ষীদেবীর কণ্ঠস্বর ঠান্ডা, 'শুনুন মিস্টার ব্যানার্জি। যদি সৎ গোয়েন্দা হন, এবং আপনার মক্কেলের আসল চেহারাটা জানতে চান, তাহলে আমার বাড়ি আজ রাত সাতটায়। আর যদি সস্তার টিকটিকি হয়ে নোংরা ঘেঁটে দু'পয়সা রোজগার করতে চান তাহলে ক্ষতি আপনারই হবে। রাখলাম।'

'মা কী...বললেন?'

অনন্ত সেনের মুখ এবার অনেকটাই ফ্যাকাশে! হোটেলের জানলার বাইরে দুপুরের রোদের হলদে আলো পরিস্থিতির গাম্ভীর্যকে কিছুটা মনোরম করার চেষ্টা করছে। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করি আমার মক্কেলের ব্যবসা কি হোটেলের। নাকি অন্য কিছু?

হঠাৎ মক্কেল গলা তোলেন। এবং তার ডান হাতটা আমার কলার চেপে ধরে।

'আমার মা আপনাকে ফোন করছেন কেন?'

অনন্ত সেনের মুঠোর জোর যে খুব শক্ত হবে না সেটা আমি জানতাম। তবুও পেছন দিকে হেলে যাই। নিজের টাল সামলাতে না পেরে ও হুমড়ি খেয়ে আমার ওপরেই পড়ে। ওইভাবে দুজনে হোটেলের খাটে। আমি বাঁ হাতে সযত্নে ওঁর পকেট থেকে ওর ফোনটা বার করে নিয়ে নিজের পকেটে ভরে নিই। ডান হতে ওঁকে আলতো করে তুলে ওঁর হতভম্ব, লাল মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁকে আবার বোঝাই যে উনি একজন আমারই মতো সস্তার টিকটিকিকে জেনেশুনেই খুন করেছেন, কলকাতার গেস্ট হাউসে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয়। দু'দিন আগে তাঁকে বাঁচিয়েছি। আর বাঁচাব না। তাঁর পার্টনার বোকা এবং নাটুকে। এবং আমাকে পুরীতে ডেকে এনে রতন রাউতকে সাবধান করাতে গিয়ে উনি আরও বেশি বোকামি করেছেন।

'যেহেতু আপনি আমার মক্কেল তাই আজ রাতটা দেখব। কাল সকালে আমাকে সব সত্যি কথা না বললে কলকাতার পুলিশ আপনাকে বিপ্লববাবুর খুনের জন্য অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করবে।'

হোটেলের ঘরটা হঠাৎই নিজের হয়ে গিয়েছিল। দরজা খুলে বেরিয়ে যাই।

হোটেল থেকে বেরোবার পর, লাল মাফলার আবার আমার পিছু নেয়। নানা অলি-গলির মধ্যে দিয়ে তাকে এড়াতে পেরে স্বর্গদ্বারের কাছে একটা খুবই সস্তার হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়ে, সেই ঘরে ঢুকে বাঁ পকেটের ফোনটা বার করে দেখি সেটার কাভার লাল।

ঘণ্টাখানেক ওই ফোন নিয়ে কাটাই। তারপর বারান্দায় বসে অদূরের সমুদ্র দেখা। পুরীর সমুদ্রে গোধূলির আলো মনের ভেতরের তোলপাড়কে কোনো ভাবেই শান্ত করতে পারেনি।

রতন রাউতের ফুলমাকারার ছ'তলার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধে ছ'টা।

দরজা খুলে দিয়েছিল এক সুন্দরী মহিলা। আর কিছু মনে নেই। মাথার পেছনে একটা কড়া বিদ্যুৎ।

সুন্দরী মহিলা ঝাপসা হয়ে যায়।

আট

সুন্দরী মহিলা আবার একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন আমি একটা লম্বা সোফায় শুয়ে। ঘরে আলোর রং নীল এবং মাথার তালুতে একটা গরম যন্ত্রণা।

সুন্দরী মহিলা জানতে চায় আমি কী নেব? হুইস্কি না কড়া কফি। আমি জানাই একটু সস্তার রাম হলেই চলবে। আমি উঠে বসার চেষ্টা করি। সুন্দরী আমাকে খুব লম্বা একটা গেলাসে খুবই দামি এক পেগ রাম এনে দেয়। তার নখের রং-ও নীল।

আমার গা ঘেঁষে, তার হাতকাটা ব্লাউজ আর পাতলা শাড়ির নিচের নরম শরীরটা প্রায় আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'হাই! আমার নাম কেতকী। আপনি কি গোয়েন্দা?'

আমি গেলাসের গোটা রাম গলায় ঢেলে দিয়ে বললাম, 'সব বলব যদি আপনি বলেন!'

'কী?' ওর ঠোঁটদুটো আমার গালে ছুঁই ছুঁই।

'আপনি কী করেন? রতনবাবুর বউ? তার রক্ষিতা? নাকি তার ব্যবসার মূলধন?'

সুন্দরী কিছু বলার আগেই রতন রাউতের নাটকীয় প্রবেশ। সাদার বদলে এবার নীল। পাজামা এবং পাঞ্জাবি। হাতে চুরুট। অন্য হাতে পিস্তল।

'ওই নোকিয়া ফোনটা কোথায়?'

'পুরীর কোনো এক হোটেলের ঘরের বাথরুমের সিসটার্ন-এর ভেতরে, প্লাস্টিকে মোড়া। আপনাকে খুঁজে নিতে হবে।'

সুন্দরী সরে বসেছে। আমি দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে মাথার ব্যথায় বসে পড়ি। রতন রাউত এগিয়ে আসে। ঘরের নীল আলোয় তাঁর পিস্তলের রং প্রায় সাদা।

'ওই ফোনটা আমি নেবই মিস্টার শর্মা। আমাকে গুলি করতে বাধ্য করবেন না।'

আমি মাথার ব্যথা অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দরীর দিকে হাতের খালি গেলাসটা বাড়িয়ে দিই। 'আর একটা।'

সুন্দরী সামান্য ইতস্তত করে ওটা নিয়ে নেয়। কিন্তু বসেই থাকে।

রতনবাবু তার নাটক শুরু করার আগেই আমি শুরু করি।

যার সারমর্ম হল যে আমাকে দেখে তার মনে হয় যে আমি মোটামুটি পোক্ত একজন টিকটিকি। আমায় সস্তায় কাজে লাগাতে চান কারণ অনন্তবাবুর সঙ্গে আমার সরাসরি যোগাযোগ। আমাকে সত্তর হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে অনন্তবাবুর ফোনটা হাতাতে চান। উনি তক্কে তক্কে ছিলেন যে আমি সত্তর হাজার-এর জন্য ফোনটা ওঁর কাছে বেচতে আসব। আমি আসামাত্রই আমার মাথায় মেরে, অজ্ঞান করে আমার পকেট হাতড়ে ফোন না পেয়ে এবার পিস্তলের সাহায্য নিয়েছেন। উনি জানেন ফোন আমি কোথাও লুকিয়েছি। যে ফোনে ওঁর পুরীতে টুরিস্টদের কাছে মেয়েছেলে সাপ্লাই দেবার ব্যবসার অনেক প্রমাণ আছে। যে তথ্যের ভিত্তিতে অনন্তবাবু ওঁকে ব্ল্যাকমেল করছিলেন। এবং উনি ওঁকে মারার হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন।

'ফোন আপনি খুঁজে পাবেন না। পিস্তলের গুলি বেকার খরচা হবে। ওই ব্যবসার সমস্ত তথ্য কলকাতা পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি, আগামিকালই পুরীর পুলিশ আপনার দোরগোড়ায় আসবে সব তথ্য নিয়ে। এবং আমার মৃতদেহ যেখানেই পুঁতে রাখুন ভোগান্তি বাড়বে। সুতরাং খারাপ অভিনয় বন্ধ করুন। কীভাবে জেল থেকে ছাড়া পাবেন সেটা ভাবুন। আপনার বাঁচার একমাত্র রাস্তা আমি।'

রতন রাউতের পিস্তল নেমে যায়। আমাকে টাকা দিয়ে কেনার চেষ্টা। প্রায় হাতে পায়ে ধরা, এবং আমার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি... সব পর্ব চুকিয়ে নিমাপাড়ার মীনাক্ষী দেবীর বাড়ি পৌঁছতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় আধঘণ্টা।

নিচের দরজা খোলা। ওপরে উঠে গিয়ে বসার ঘরের বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি কারণ ভেতরে ঘটনার ঘনঘটা তুঙ্গে।

বইয়ে ঠাসা বসার ঘরের এক কোণে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আমার মক্কেল

অনন্ত সেন। উলটোদিকে ক্ষিপ্ত মীনাক্ষী দেবী। একটা দেরাজের সামনে নির্মলবাবু।

ছেলের পিস্তলকে তোয়াক্কা না করেই মীনাক্ষী দেবী গর্জে ওঠেন।

'তোমার নোংরা ব্যবসা আমি ফাঁস করে দিতাম অনেক দিন আগেই অনন্ত। নেহাত তোমার বাবা আমাকে আটকে রেখেছিলেন। তোমার হোটেলের ব্যবসা চলে না সেটা গোটা শহর জানে। অপরের নোংরা কেচ্ছা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করে তোমার রোজগার! আর আমি চুপ করে থাকব না। অনেক সহ্য করেছি তোমার অসভ্যতা। আর নয়। তোমার ভাড়া করা কলকাতার টিকটিকির কাছে আজ আমি সব ফাঁস করে দেব। সে আর যাই হোক, তোমার মতো একটা নোংরা গিরগিটি নয়।'

অনন্ত সেনের হাত কেঁপে উঠলেও, গলার স্বর কাঁপে না।

'আমার ফোন আমাকে ফেরত দাও। আমার ভাড়া করা মালকে দিয়ে তুমি আমার ফোন হাতিয়েছ। সেটা নিয়ে আমি এখান থেকে যাব।'

'তোমার ফোন কে চুরি করেছে আমি জানি না। তবে যদি চুরি হয়ে থাকে তাহলে তোমার সব খেলা শেষ। তুমি আমাকে মেরে পার পাবে না।'

'তুমি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগাওনি? আমাকে মেরে আমার ফোন চুরি করার জন্য? তোমাদের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ভদ্দরলোকের কেচ্ছা ফাঁস হয়ে যাবে বলে নিজের ছেলেকে খুন করতে চাওনি? তোমার ভাড়া করা টিকটিকি মরেছে। তুমিও মরবে মা। ফোন কোথায়? সুব্রত শর্মাকে কত টাকা দিয়ে কিনেছ?'

এবার নির্মলবাবুর গলা, 'অনন্ত অনেক ছেলেমানুষি, অনেক বোকামি হয়েছে, এটা বন্ধ করো।'

'চোপ শুয়োরের বাচ্চা! বাবার পেছনে মার সঙ্গে সড় করে এই বাড়ি হাতিয়েছ তুমি। আমি অশিক্ষিত, লম্পট, জানোয়ার। তোমরা কী? ভদ্দরলোক? এই ভদ্দরলোকের মুখোশ আমি টেনে খুলে দেব। আজ যা হয় হবে। মা এবং তুমি দুজনেই মরবে। যেরকম মরেছিল আমার বাবা!'

'তোমার বাবা একজন ভিতু লোক ছিল অনন্ত! অনেক বিদ্বান, অনেক বুদ্ধিমান, কিন্তু বেসিকালি ভিতু। তাই তোমার অসভ্যতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আমি যা কিছু পেয়েছি তার কাছ থেকেই। কিন্তু তার ভয়টা আমি পাইনি। আমি তোমাকে ভয় পাই না। আগেও তোমার নোংরা ব্যবসাকে বন্ধ করার

চেষ্টা করেছি। আজও করব। তোমার ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা আর সহ্য করব না। একটু পরেই তোমার ভাড়া করা টিকটিকি এখানে আসবে...তারপর? তারপর কী হবে?

অনন্ত সেন তার পিস্তল তোলে। গুলি চলে। কিন্তু অনন্ত সেনের পিস্তল থেকে নয়। অনন্ত সেন গুলি খেয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তার হাত থেকে পিস্তল পড়ে যায়। তারপর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

নয়

চৈত্র মাস। আমাদের ম্যাকলয়েড স্ট্রিটের অফিসের ইলেকট্রিসিটির বিল ছ'মাস দেওয়া হয়নি বলে, সত্তর বছরের পুরোনো পাখা স্তব্ধ। গুমোট সন্ধেবেলায় বেরোবার তোড়জোড় করছি। ড্যানি ব্যানার্জি ঘামতে ঘামতে, তার কালো জামা আর কালো চশমা পরে অফিসে ঢুকে তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে, 'পরশু থেকে পাখা চলবে!'

আমি কিছু বলতে চাইনি। জানতেও চাইনি।

'যাবার আগে এক পাত্তর খেয়ে যাও। ভদ্দরলোকের মতো! পরশু থেকে আর ঘামতে হবে না। ইলেকট্রিকের বিল মিটিয়ে দিয়েছি। কাল একটা মাসের মাইনেও পাবে। এই বাজারে কম কী সুব্রত? একটু সেলিব্রেট করবে না?'

আমি যথারীতি তাঁর দেরাজ খুলে সস্তার মদের বোতল বার করে দুটো গেলাসে ঢালি। কোনো কিছু না ভেবেই, বলতে হয় বলেই বললাম, 'কেস মিটল?'

'একদম! বাকি টাকা, প্লাস উপরি!'

ড্যানির গেলাসটা তার দিকে এগিয়ে দিই।

'মক্কেল খুশি হয়ে উপরি দিল?'

ড্যানি হঠাৎ ওই ক্লান্ত অবস্থাতেই লাফিয়ে উঠে আমাকে তার ঘেমো গায় জড়িয়ে ধরল।

'তুমি বড্ড সরল সুব্রত! গরমে মাথা গরম হয়ে গেছে তাই বুদ্ধির থেকে অনুভূতিকে বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছ। পরশু দিন পাখা চললে বুঝতে পারবে সহজে কিছুই মেলে না। কেউ উপরি দেয় না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজন নিজেদেরই মেটাতে হয়। দয়া বস্তুটা দুনিয়ায় থাকলেও সেটা মাগনায় আসে না। বসো। বসে পড়ো। তোমার বুড়ো বস তোমাকে অনুরোধ করছে। তোমার সঙ্গে একটু সেলিব্রেট করতে চাইছে। বসো।'

আমি বসে পড়ি। এবং প্রবল গরম, বিরক্তি এবং জীবনের অনিশ্চয়তা অস্বীকার করে ড্যানির চোখের দিকে তাকাই। হঠাৎ মনে হয়, লোকটা আমার থেকে অনেক বেশি খেটে আমার দেখভাল করতে পারার আনন্দটা উপভোগ করতে চায়। সত্যিই তো, আমার জীবনের অনিশ্চয়তা তো আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। ড্যানি ব্যানার্জি নিজের মদের খরচা ছাড়া আর সব কিছু এই নড়বড়ে এজেন্সির পেছনেই ঢালছে। তার সঙ্গে ঘামতে ঘামতে, তার জ্ঞান শুনে যদি একটা সন্ধে কাটে তো কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? নিজের বুদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়ে অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিই।

'মক্কেলকে কে ব্ল্যাকমেল করছিল? কোনো বড়, আমলা, মন্ত্রী, বড়লোক?'

'ধুর! মক্কেল নিজেই ব্ল্যাকমেল করছিল। যাকে করছিল সে বর্ধমান মহারাজার বংশধর। সি ই এস সি'র ডিরেক্টর! মক্কেলকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার জন্য সে এখন উঠে পড়ে লেগেছে আমার অফিসের কারেন্ট কী করে ফিরে আসে। আর জোর করে এক লাখ দেবেই। কোনো মতে পঁচিশ হাজার নিয়ে তার হাত থেকে নিস্তার পেলাম।'

ড্যানি কিছুক্ষণ নীরব। তারপর সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'সুব্রত, ভালো গোয়েন্দা হতে গেলে খুব একটা বুদ্ধি লাগে না। একটু চালাকি আর বাকিটা সাহস। যে কেউ হতে পারে। ভালো গোয়েন্দা হতে।'...

পুরীর নিমাপাড়ার বাড়িতে সদ্য সদ্য মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে অনন্ত সেন। তার পড়ে থাকা লাশের পেছন থেকে চাপ চাপ রক্ত বেরোচ্ছে। নির্মলবাবুর হাতের পিস্তল তিনি দেরাজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মীনাক্ষী দেবী স্তব্ধ।

আমি বসার ঘরে ঢুকলাম।

মীনাক্ষী দেবী একটা সোফায় বসে পড়লেন। 'এত দেরি করে ফেললেন!'

নির্মলবাবু প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'অনন্ত মীনাক্ষীকে গুলি করত!'

আমি শান্তভাবে জানাই যে আমি সেটা দেখেছি। এবং পুলিশ এলে সেটাই বলব। আত্মরক্ষা করার জন্যই তারা অনন্ত সেনকে গুলি করেন। আমার কলকাতা পুলিশে যা যোগাযোগ আছে, তাদের সুবাদে যদি পুরীর পুলিশ আমাকে বিশ্বাস করে, তাহলে ওঁদের কোনো ক্ষতি হবে না।

'আপনি পুলিশে ফোন করুন।'

মীনাক্ষী দেবী ঠান্ডা গলায় বললেন।

আমি আরও ঠান্ডা হয়েই, অনন্তবাবুর লাশটা ডিঙিয়ে বসার ঘর পেরিয়ে,

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। একটা সিগারেট ধরাই। দূর থেকে চাঁদের আলোতে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

'এই বারান্দাটা কি সত্যিই ভাঙা ছিল?'

উত্তরটা নির্মলবাবু দেন।

'মানে?'

'মানে যখন শিশির সেন বেশি মদ্যপান করে এই বারান্দা থেকে পড়ে মারা যান?'

আমার মক্কেল, মৃত অনন্ত সেনের দেহ থেকে রক্ত বেরিয়ে চলেছে। ঘরের নীরবতার ওপর তখন গোটা একটা বিশ্বনাথের মন্দির বসানো যায়।

নির্মলবাবু বারান্দায় বেরিয়ে আসেন।

'আপনি ঠিক কী বলতে চান?'

আমি তাঁকে অগ্রাহ্য করেই ঘরের ভেতরে ঢুকে, মীনাক্ষী দেবীর উলটো দিকের একটা সোফার পেছনে দাঁড়াই।

'প্রশ্নটা আপনাকে করেছি মীনাক্ষী দেবী। আপনি আজ আমাকে ডেকে পাঠান, তাই এসেছি। দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু আপনার কি আমাকে কিছু বলার আছে? সেটা জানার পরই আমি পুলিশ ডাকব।'

মীনাক্ষী দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে যান। নির্মলবাবু একটা চেয়ারে বসেন। অদূরে সমুদ্রের গর্জন স্পষ্ট। উনি ধীরস্থির গলায় আমাকে জানান যে শিশিরের উনি সহপাঠী ছিলেন। একই সঙ্গে, একই আদর্শে বড় হয়েছেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে। ষাটের দশকের খাদ্য আন্দোলন। আরও অনেক প্রতিবাদী মিটিং মিছিল করেছেন তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য। শিশিরবাবু বিলেতে ভালো চাকরি উপেক্ষা করে শিক্ষকতার চাকরিতে মন দেন। ওঁর বাবার প্রতিপত্তি এবং সম্পত্তি উপেক্ষা করে নিজের চেষ্টায় একটু একটু করে জীবনে উন্নতি করেন। বিস্তর লেখাপড়া। কলকাতার তাবড়তাবড় বুদ্ধিজীবীদের বন্ধু এবং শঙ্খ ঘোষের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। মীনাক্ষীর সঙ্গে পরিচয় হয় নানা মানবাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে। ওদের মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্যই ওরা বিয়ে করেন। মীনাক্ষীর মতো, সৎ, সাহসী মহিলা উনি জীবনে খুব কম দেখেছেন। কিন্তু ছেলে অনন্তকে অনেক খুবই স্বাধীনভাবে মানুষ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও দুজনে ব্যর্থ হন। স্বাধীনতার ফল হলো উচ্ছৃঙ্খলতা। কী করে যে এরকম দুটো,

এত বড় মাপের মানুষের সন্তান এতটা খারাপ হয়ে গেল নির্মলবাবু বুঝে উঠতে পারেননি।

'রিটায়ার করে, যখন এরা পুরীতে শিশিরের পৈতৃক বাড়িতে চলে এল, তখন থেকেই শিশির কেমন বদলে যেতে লাগল। সে অনন্তর সংস্পর্শ চাইত। বাবা হলে যা হয়। মীনাক্ষী কিন্তু অনন্তর অবনতি কিছুতেই মানতে পারেনি। বার বার শিশিরকে বলত ছেলেকে আইনের হাতে তুলে দিতে। শিশির কিছুতেই রাজি হত না। শিশির আমাকে বলেছে, সমাজ কী ভাববে? বংশের মান-সম্মান সব যাবে। আমাকে বলত মীনাক্ষীকে বোঝাতে। শিশিরের মদ্যপান করা বেড়ে গেল!...'

মীনাক্ষী দেবী বোধহয় মুখ ধুয়ে এলেন। ওঁর শেলের চশমার পেছনে চোখ লাল। একটা সাদা বিছানার চাদর দিয়ে ছেলের লাশটা ঢেকে দিলেন।

'আপনি পুলিশে খবর দেবেন মিস্টার শর্মা? না হলে আমিই ফোন করব।'

রাত প্রায় ন'টা। আমি মুখ না তুলেই বলি, 'পুলিশকে সব সত্যি কথা বলবেন তো?'

মীনাক্ষী দেবীর কণ্ঠস্বরের বিরক্তির মধ্যে কোথাও একটা ক্ষীণ অসহায়তা।

'মানে? কী বলতে চাইছেন?'

আমি না উঠেই, রতন রাউতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, ওঁদের বাড়ি আসার আগে, আমার সস্তার হোটেলের ঘরে লুকিয়ে রাখা অনন্তবাবুর লাল কভার দেওয়া ফোনটা পকেট থেকে বার করি।

দশ

কয়েক বছর আগে। এই একই ঘর। রাত হয়তো ন'টাই। শিশিরবাবু গেলাসে দামি হুইস্কি ঢালেন। মীনাক্ষী দেবী পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার হুইস্কির গেলাস কেড়ে নিতে চায়।

'তুমি পুলিশে খবর দেবে কি না?

শিশিরবাবু বারান্দায় এগিয়ে যায়।

'বোকামি কোরো না মীনাক্ষী, সে আমাদের ছেলে। এরকম একটা নোংরামির জন্য ধরা পড়লে আমাদের এতদিনকার এই সুনাম, এই খ্যাতির কী হবে বুঝতে পারছ না?'

মীনাক্ষী দেবী স্বামীকে জোর করে ঘুরিয়ে মুখোমুখি হবার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়...

'চুলোয় যাক সুনাম। একটা লম্পট ছেলে কত বড় অপরাধ করছে সব জেনে চুপ করে থাকবে? এই তোমার সততার পরিণতি? এক্ষুনি, এক্ষুনি ফোন করবে তুমি পুলিশকে।'

মীনাক্ষী তার স্বামীকে টানতে থাকেন। শিশিরবাবু জোর করে তাঁর হাত টেনে বার করতে গিয়ে বারান্দায় রেলিংয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তারপর আর টাল সামলাতে না পেরে, তাঁর হাঁটু অবধি রেলিং-এর ওপর দিয়ে, একটা চিৎকার করে অদৃশ্য হয়ে যান। নিচ থেকে একটা শব্দ আসে। একটা বালির বস্তা পড়ার শব্দ।

মীনাক্ষী দেবী তাঁর আতঙ্কিত মুখ চেপে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর ঘুরে দৌড়ে নিচে যাবার জন্য ঘরে ঢুকে থমকে যান। উলটোদিকে পুত্র অনন্ত হাতে তার সেল ফোনের ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছে।

'কী?...কী করছ তুমি?'

সেল ফোনে অনন্তকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার গলা শোনা যায়।

'বাবাকে খুন করলে তুমি।'

'কী বলছ অনন্ত?...কী?...'

'ছবির.শব্দ আমি মুছে দেব। বলব তুমি বাবাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছ কারণ বাড়িটা বাবা আমার নামে লিখে দিতে চেয়েছিল।'

সেল ফোনের ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায়।...

মীনাক্ষী দেবীর বসার ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকা লাশের ওপর সাদা চাদরে রক্তের দাগ ক্রমশ বাড়ছে।

মীনাক্ষী দেবী বসে পড়লেন। আমি দাঁড়ালাম।

'আমার ধারণা, এই ভিডিও ফুটেজ'-এর দৌলতে অনন্তবাবু আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে যাচ্ছিলেন অনেকদিন। আপনি বাধ্য হয়ে ওঁর পেছনে গোয়েন্দা লাগান। সেই গোয়েন্দার কাজ হবে কলকাতায় গিয়ে আপনার ছেলেকে ভয় দেখিয়ে এই ক্যামেরা উদ্ধার করা। অনন্তবাবু সেটা বুঝতে পারেন। আমার অফিসে এসে আমাকে তার বডিগার্ড নিয়োগ করার নাটক করেন। বলেন কেউ তাকে খুন করতে চায়। কলকাতার গোয়েন্দা তাঁর গেস্ট হাউসে পৌঁছলে, তাঁকে খুন করে আমাকে ডেকে, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে গুলি করার মিথ্যে গল্প শোনান। আসল কথা চেপে যাবার জন্য আমাকে পুরীতে ডেকে তার আর এক খদ্দের রতন রাউত, যাকেও তিনি ব্ল্যাকমেল করে যাচ্ছিলেন, তাঁকে একটু কড়কে দেবার কাজ দেন। যাতে আমি ভাবি যে রতন রাউতই তাঁকে মারার জন্য লোক পাঠিয়েছেন।'

আমি একটা সিগারেট ধরাই। মীনাক্ষীদেবী চশমা খুলে চোখ মোছেন। নির্মলবাবু দু'হাতে মাথা ঢাকেন। কোথাও একটা মাইকে হিন্দি গান বেজে' ওঠে।

'আমি কলকাতাতেই বুঝতে পারি যে অনন্তবাবু কলকাতার গোয়েন্দাকে জেনেশুনেই খুন করে। বুঝতে পারি সেই গোয়েন্দা বিপ্লববাবু অন্য কোনো কারণে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না খুন করার কারণ জানতে পারছি, প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এবং প্রমাণ যতক্ষণ না করতে পারছি অনন্তবাবু আমার মক্কেল। তিনি যখন আমায় তার পার্টনার রতনবাবুকে কড়কে দেবার জন্যে আমাকে এখানে ডেকে আনেন আমি সেই সুযোগ

নিয়ে আপনার কাছে আসি মীনাক্ষী দেবী। জানতে চাই যে অনন্তবাবুর সঙ্গে আপনার গোলমাল কেন?'

আমি সিগারেটে টান দিয়ে আবার শুরু করি।

'আমার ধারণা হয় শিশিরবাবুর সম্পত্তি নিয়ে আপনাদের মধ্যে গোলমাল। সেই নিয়ে প্রশ্ন করাতে আপনি ভাবেন অনন্তবাবু আমাকে সব বলে দিয়েছেন। তাই আমার পেছনে গুন্ডা লাগান, সে কলকাতায় গিয়ে আমাকে গুরুতরভাবে আহত করতে চায় হাওড়া স্টেশনের বাইরে। তারপর ট্রেনে করে আমাকে ফলো করে বালাসোর অবধি। অর্থাৎ আপনার ছেলের নোংরা ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা এবং চক্রান্ত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আপনিও বেআইনি রাস্তাটাই বেছে নেন মীনাক্ষীদেবী।'

'আমি বাধ্য হয়ে যা করার করেছি।' মীনাক্ষী দেবীর ভাঙা কণ্ঠস্বর কিছুটা দৃঢ়।

আমি ওঁর কথায় পরোয়া না করেই বলে যাই।

'রতন রাউতের কাছ থেকে ফোনের কথাটা জানতে পেরে সেটা আপনার ছেলের পকেট থেকে চুরি করে তার লুকিয়ে তোলা ছবিটা প্রায় বারো বার দেখেছি আমি মীনাক্ষী দেবী। ওটা অ্যাকসিডেন্ট বলে কোর্ট মেনে না নিতেও পারে।'

'আমি শিশিরকে ঠেলে ফেলে দিইনি।'

'জানি। কারণ কথাগুলো শুনেছি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আপনাদের ঝগড়ার কথাটা চেপে গিয়ে মদ খেয়ে পড়ে যাবার গপ্পোটা কেন বললেন?'

মীনাক্ষী দেবী উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকায়। চোখের জলে গাল এবং ব্লাউজ ভিজে গেছে।

'আমাদের এতদিনকার পরিশ্রম, বিশ্বাস, মূল্যবোধ সব নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল অনন্ত! একটা এত বড় বংশের ছেলে স্রেফ মানুষের কেচ্ছা ব্ল্যাকমেল করে রোজগার করে। তাকে শাস্তি দিতে চেয়ে আমি হেরে গেছি।'

নির্মলবাবু মুখ তোলেন।

'ওই ফোনটা অনন্তর কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমিই কলকাতার বিপ্লববাবুকে নিয়োগ করি। আর একজন স্থানীয় গুন্ডাকে বলি আপনাকে একটু...জখম করতে।'

ড্যানি ব্যানার্জি হলে কী করত আমি জানি না। আমি অনন্ত সেনের ফোনটা সোফায় ফেলে দিই।

'আমার কাজ শেষ। অনন্তবাবু দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিলেন। বাকি টাকার আমার প্রয়োজন নেই। পুলিশ আপনারা ডাকবেন। তাদের যা বলার আপনারাই বলবেন। অবশ্যই নির্মলবাবু গুলি না করলে অনন্তবাবু তাঁর মা'কে খুন করত। সুতরাং আত্মরক্ষা। আপনাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি এই চত্বরে। আপনাদের কথা পুলিশ বিশ্বাস করবে। আমার সাক্ষী দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। চলি।'

আমি দরজা অবধি এগোতে পারিনি।

'সুব্রতবাবু!'

মীনাক্ষী দেবী আমার দিকে এগিয়ে আসেন। কণ্ঠস্বর ক্লান্ত।

'আপনি থাকুন। প্লিজ়।'

আমি না ঘুরেই উত্তর দিই।

'আমি থাকলে ফোনের কথাটা আমি লুকোব না। আপনাকেও আপনার স্বামীর মৃত্যুর আসল কারণটা স্বীকার করে নিতে হবে। আপনি খুন করেননি সেটা ফোনের শব্দ শুনলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু পুলিশের কাছে মিথ্যে বলার শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। তাতে আপনাদের আদর্শবাদী পরিচয়, সুনাম, অনেকটাই বরবাদ হয়ে যাবে। সুতরাং ভেবে নিন।'

মীনাক্ষী দেবী বেশ স্পষ্টভাবে বলেন, 'আপনি কোনোদিন কোনো বড় বিশ্বাসের জন্য লড়াই করেছেন সুব্রতবাবু? আমি ট্রাম ধর্মঘটের সময় জেল খেটেছি।'

আমি ঘুরে দাঁড়াই। পায়ের কাছে মৃত মক্কেলের লাশের দিকে তাকাইনি।

'না ম্যাডাম। আমি না কোনো প্রতিবাদী মিছিলে হেঁটেছি, না কোনো আন্দোলন করেছি। আমার অফিসের সহকর্মীর মাসের মাইনে আর ইলেকট্রিক বিলের দায়িত্বটুকু ঠিকভাবে মেটাতে পারছি না। অন্য লোকের নোংরা ঘেঁটে সত্যি খুঁজে বার করে, দু'পয়সা রোজগার করি। তাই সত্যি কথা আমাকে বলতেই হবে। মিথ্যে বলতে পারব না।'

ফোনটা সোফা থেকে তুলে নিয়ে। মক্কেলের লাশটা ডিঙিয়ে মীনাক্ষী দেবীর হাতে তুলে দিই সযত্নে।

'আপনাদের আদর্শবাদী জীবনের ভেতরের নোংরা আপনার হাতেই দিয়ে

গেলাম। ডিলিট করবেন, কী আরও মিথ্যের আশ্রয় নেবেন, সেটা আপনার ব্যাপার।'

আর দাঁড়াইনি। অনেকটা হাঁটার পর, একেবারে সমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়াই। তারাভরা আকাশের নিচে উত্তাল সমুদ্র। আরও খানিকটা হেঁটে গিয়ে নিজেকে সেই বরফের মতো ঠান্ডা ঢেউয়ের ওপরে ভাসিয়ে দিই।

—

ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি

গোয়েন্দা সুব্রত শর্মার তিনটি রহস্য কাহিনি

অঞ্জন দত্ত



দে'জ পাবলিশিং

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com